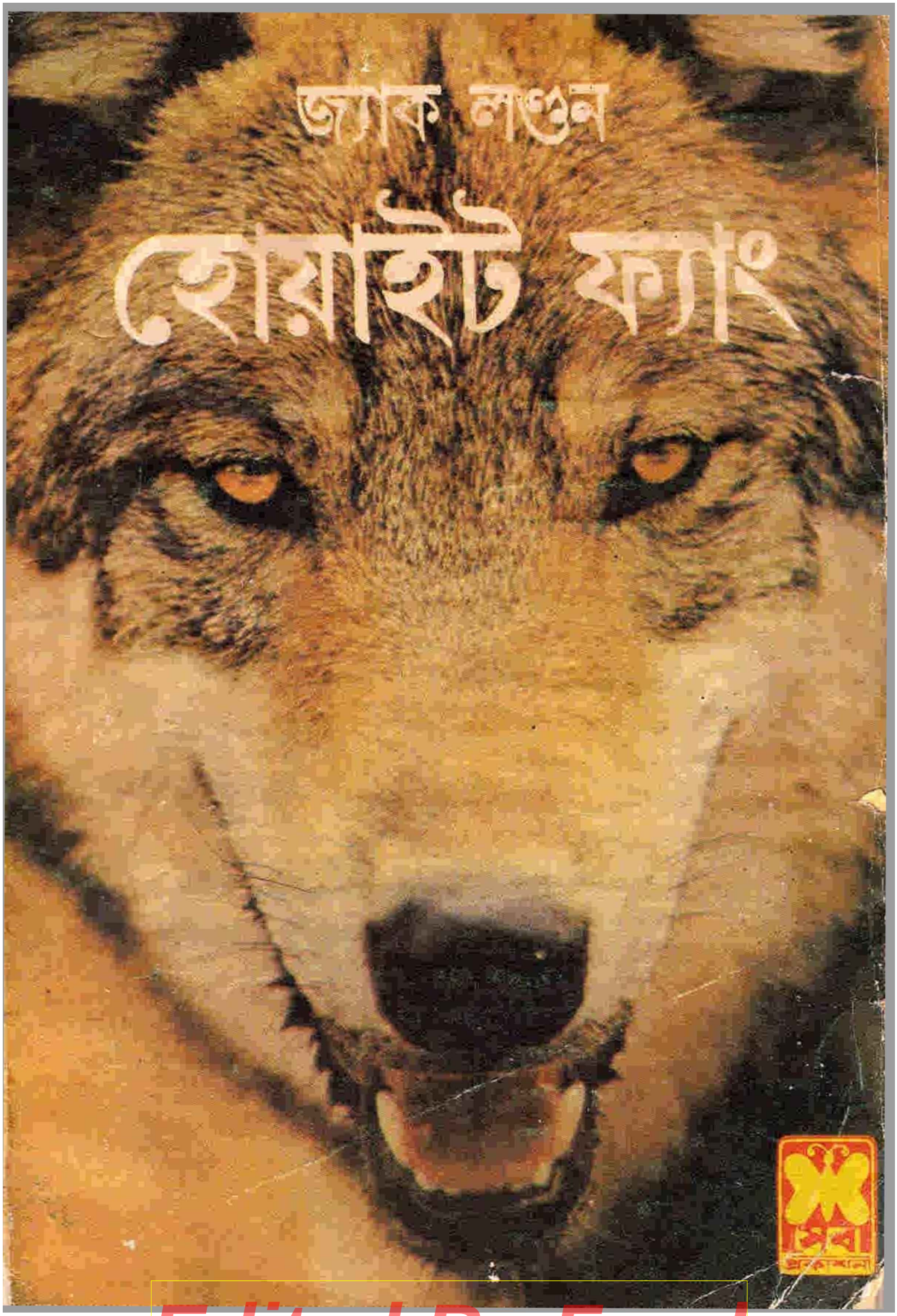

Edited By Fuad

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

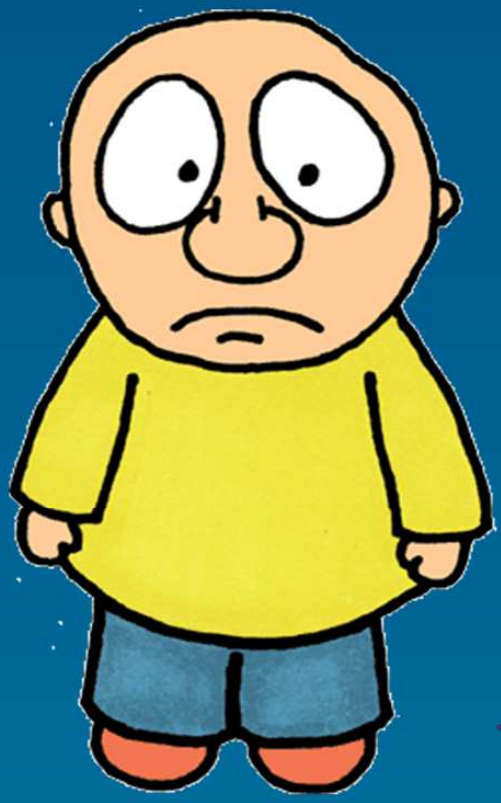

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

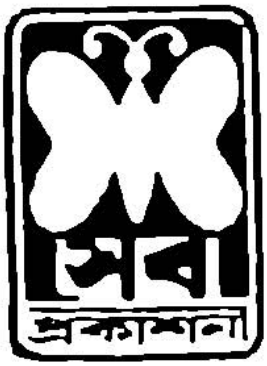

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্বিঘ্নায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

এক

মাংসের খোঁজে

দেবদারু গাছের সারির মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বরফ-জমা শীর্ণ নদী। সাম্প্রতিক ঝড় গাছগুলোর গা থেকে খুলে নিয়েছে বরফের চাদর। আর তাই সন্ধ্যার পদসঞ্চারে সেগুলোর চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। প্রাণের কোনোরকম স্পন্দন নেই পুরো অঞ্চল জুড়ে। তবু মনে হয়, প্রকৃতির একটা চাপা হাসি যেন ছড়িয়ে রয়েছে এখানে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সে-হাসি বিষণ্ণতাকে হার মানায়, সে-হাসি সিংহের হাসির মতোই নিরানন্দ। প্রকৃতির এই রূঢ় হাসি সম্ভবত অপ্রতিরোধ্য জীবন-সংগ্রামকে লক্ষ্য করে। কারণ, হিংস্র ভয়ঙ্কর সুমেরু জীবনের সাড়া পছন্দ করে না।

কিন্তু নিদারুণ প্রাকৃতিক বৈরিতা উপেক্ষা করেও জীবন এখানে বহমান। নেকড়ের মতো কয়েকটা কুকুর টেনে নিয়ে আসছে একটা স্লেজ। তুষারের কণা ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সারা গায়ে। শক্ত বার্চ কাঠে তৈরি স্লেজটার কোনো ঢাকা নেই, ফলে পুরো কাঠামোটাই হেঁচড়ে চলেছে বরফের ওপর দিয়ে। স্লেজের ওপরে গোটাকতক কম্বল, একটা কুড়াল,

কফির পাত্র, ফ্রাইং-প্যান আর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা লম্বা, সরু, আয়তাকার একটা বাক্স। বাক্সটাই জুড়ে রয়েছে অধিকাংশ জায়গা।

স্লেজের সামনে কুকুরগুলোকে সাহায্য করতে করতে এগিয়ে চলেছে একজন মানুষ, পেছনে পেছনে হেঁটে আসছে আরেকজন। তৃতীয় মানুষটাকে আর কখনোই পরিশ্রম করতে হবে না, নিথর হয়ে সে শুয়ে আছে কফিনটার মধ্যে। যে-কোনোরকমের সচলতা সুমেরুর অসহ্য। তাই এমনকি নদীকেও সে লুটিয়ে পড়তে দেয় না সাগরের বুকে। তার বরফ বাহিনী নদীকে স্তব্ধ করে দেয়। তবে মানুষকে স্তব্ধ করে দিতে পারলেই সে খুশি হয় সবচেয়ে বেশি। কারণ, অনন্তকাল ধরে মানুষ বিদ্রোহ করে এসেছে এই জড়তার বিরুদ্ধে। যাবতীয় চঞ্চলতার মধ্যে সে-ই সবচেয়ে কর্মচঞ্চল।

স্লেজের সামনে-পেছনে এগিয়ে চলা লোকদুটোর মধ্যে অসাড়তার কোনো চিহ্ন এখনো ফুটে ওঠেনি। চামড়া আর লোমের পোশাক তাদের পরনে। নাক-মুখ দিয়ে বেরোনো নিঃশ্বাস তৎক্ষণাৎ বরফ হয়ে যাবার কারণে দুজনেরই চোখের পাতা, গাল আর ঠোঁট প্রায় ঢাকা পড়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছোট ছোট বরফের কণায়। বরফের সেই ভূতুড়ে মুখোশ দেখে মনে হচ্ছে, ভূত-প্রেতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে তারা যেন এগিয়ে চলেছে অশরীরী কোনো জগতের উদ্দেশে।

কোনো কথা বলছে না তারা নিজেদের মধ্যে। কারণ, কথা বলার অর্থই হলো, শক্তির অহেতুক অপচয়। আর এই স্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে চারপাশের হিমেল নৈঃশব্দ্যও ধীরে ধীরে চেপে বসছে তাদের ওপর, ঠিক যেমন ডুবুরির চেতনার ওপর চেপে বসে অতল জলের নীরবতা। শুধু এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেই মানুষ অনুভব করে প্রকৃতির শক্তি কতো অন্ধ, কতো নির্মম—যে শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বুদ্ধি

আর কৌশলই তার একমাত্র হাতিয়ার।

ঘণ্টা দুয়েক পর ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা। এমনিতেই সূর্য এখানে দেখা যায় না, ফ্যাকাসে একটা আলো কেবল ছড়িয়ে থাকে চারপাশে সে-আলোও কমে এলো ধীরে ধীরে। হঠাৎ স্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এলো তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার। এটাকে পথভ্রষ্ট কোনো প্রেতাত্মার চিৎকার বলে ভেবে নেয়া যেতো, যদি না এর সাথে মিশে থাকতো তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা। পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো দুজন।

এই সময়েই শোনা গেল দ্বিতীয় চিৎকার। দুজনের কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না, চিৎকারটা এসেছে তাদের পেছন থেকে। আবার, যেন দ্বিতীয় চিৎকারের জবাবেই ভেসে এলো তৃতীয় আরেকটা চিৎকার। আর এটাও এলো তাদের পেছনে ফেলে আসা পথের ওপর থেকে।

'ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে, বিল,' বললো সামনের লোকটা।

তার গলা কর্কশ, ফ্যাসফেঁসে, যেন কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

'মাংসের খুবই অভাব পড়েছে,' বললো তার সাথী। 'দিনের পর দিন যাচ্ছে, অথচ একটা খরগোশ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।'

রাত নামার পর নদীর ধারের কিছু দেবদারু গাছের মাঝখানে তাঁবু ফেললো তারা। আগুন জ্বাললো। তারপর কফিনটাকে ব্যবহার করলো চেয়ার আর টেবিল হিসেবে। আগুনের ওপাশে দল বেঁধে গজরাতে লাগলো কুকুরগুলো, খেয়োখেয়ি করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে, কিন্তু অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চুপিচুপি কেটে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখালো না।

'হেনরি, আমার মনে হচ্ছে, [illegible]মাদের তাঁবুর আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে,' বললো বিল।

একমনে কফি তৈরি করছিলো হেনরি, কোনো জবাব দিলো না সে। ধীরেসুস্থে কাজ শেষ করে কফিমের ওপর বসে কফিতে কয়েকটা চুমুক দেয়ার পর বললো, 'আমাদের কুকুরগুলো ভালো করেই জানে, কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। ওরা কারো শিকার হবে না, বরং শিকার করবে। ব্যাটারা খুব চালাক।'

মাথা ঝাঁকালো বিল। 'কি জানি, আমার কিন্তু খুব একটা ভরসা হচ্ছে না।'

বড়ো বড়ো চোখে হেনরি চাইলো বিলের দিকে। 'এই প্রথম কুকুরদের বুদ্ধির ওপর আস্থা হারাতে দেখলাম তোমাকে।'

'হেনরি,' মটরশুঁটি চিবুতে চিবুতে বললো বিল। 'আজ খাবার দেয়ার সময় কুকুরগুলো কিরকম কামড়াকামড়ি শুরু করে দিয়েছিলো, দেখেছো?'

'হ্যাঁ, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ যেন কামড়াকামড়িটা একটু বেশি করছিলো ওরা,' স্বীকার করলো হেনরি।

'ঠিক করে বলো তো, আমাদের কয়টা কুকুর আছে?'

'ছ'টা।'

'বেশ, তাহলে শোনো···'বলে একটু থামলো বিল, যেন এতে করে তার কথার গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যাবে। 'আমাদের কুকুর সব-সুদ্ধ ছয়টা, তাই না? যদি তা-ই হয়, আজ সকালে ছয়টা মাছ বের করা সত্ত্বেও একটা মাছ কম পড়লো কেন?'

'তুমি গুনতে ভুল করেছো।'

'গুনতে আমি মোটেই ভুল করিনি,' নিরুত্তাপ গলায় বললো বিল। 'ঝোলা থেকে ছয়টা মাছ বের করলাম, কিন্তু কানকাটাটার ভাগে কোনো মাছ পড়লো না। পরে আবার একটা মাছ বের করে পেতে

দিলাম ওকে।'

'কিন্তু কুকুর ৫ । আমাদের ছ'টাই,' বললো হেনরি।

'হতে পারে,' বললো বিল, 'কিন্তু পরিষ্কার শুনে রাখো, মাছ খেয়েছে সাতটা কুকুর।'

খাওয়া বন্ধ করে কুকুর গুনতে লাগলো হেনরি।

তারপর বললো, 'ওই দেখো, ছ'টাই আছে।'

'আরেকটাকে আমি পালিয়ে যেতে দেখেছি,' ঠা । গলায় বললো বিল। 'তখন ছিলো সাতটা।'

সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিলের দিকে তাকিয়ে হেনরি বললো, যাত্রাটা সত্যিই বিশ্রী, শেষ হলে বেঁচে যাই।'

'তার মানে?' জানতে চাইলো বিল।

'মানে খুবই সোজা। লাশ বইতে বইতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, আর তার ফলেই দেখতে পাচ্ছো অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস।'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' গম্ভীর গলায় বললো বিল। 'তাই কুকুরটা যেদিক দিয়ে সটকে পড়লো, পরে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছি। পরিষ্কার পায়ের চিহ্ন ফুটে আছে বরফের ওপর। তুমি যদি দেখতে চাও, দেখিয়ে দিতে পারি।'

আর কোনো কথা না বলে মটরশুঁটি চিবুতে লাগলো হেনরি। তারপর এক কাপ গরম কফি খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে বললো, 'তাহলে তুমি ভাবছো—'

কথা শেষ হবার আগেই অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো ক্ষুধার্ত এক আর্তচিৎকার। কান পেতে শব্দটা শুনলো হেনরি, তারপর অন্ধকারের দিকে হাত নেড়ে শেষ করলো বাক্যটা —'কাণ্ডটা ওই ব্যাটাদেরই কেউ করছে?'

মাথা ঝাঁকালো বিল। 'তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো, চিৎকারটা শোনার সাথে সাথে কুকুরগুলোও কেমন ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো!'

কিছুক্ষণ পর ভেসে এলো আবার একটা চিৎকার, তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর এলো আরেক পাশ থেকে। দেখতে দেখতে চারপাশ থেকে ভেসে আসা চিৎকারে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো স্তব্ধতা। কুকুরগুলো গাদা-গাদি করতে করতে আগুনের এতো কাছে চলে এলো যে, শিখা লেগে পুড়ে যেতে লাগলো তাদের দু'একটা লোম। আগুনে আরো কয়েকটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিয়ে পাইপ ধরালো বিল।

'আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন সব সময় কী একটা ভাবছো,' বললো হেনরি।

'হেনরি···' থেমে কষে পাইপে কয়েকটা টান দিলো বিল। 'আমি ভাবছি, আমাদের দু'জনের চেয়ে ওই লোকটার ভাগ্য অনেক ভালো।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে কফিনটা দেখিয়ে দিলো সে।

'হেনরি, আমরা মরার পর কবর দেয়ার জন্যে আমাদের ভাগ্যে কয়েকটা পাথরও জুটবে কিনা সন্দেহ। আমাদের মৃতদেহ হয়তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে কুকুরের পাল!'

'ঠিকই বলেছো, টাকা-পয়সা বলে তো কিছুই নেই আমাদের,' জবাব দিলো হেনরি। 'টাকা-পয়সা না থাকলে পৃথিবীতে তার কোনো মূল্য নেই। লোকটার টাকা আছে বলেই আমরা ওর কফিনটা বয়ে নিয়ে চলেছি। আমাদের নেই, সুতরাং আমাদেরটা কেউই বইবে না!'

'হেনরি, তুমি যা ভাবছো, আমি কিন্তু তা ভাবছি না। নিজের দেশে এই লোকটা জমিদার গোছের কিছু একটা ছিলো, অর্থ কিংবা প্রতি-পত্তি কোনোটারই অভাব ছিলো না তার। অথচ এই হতভাগা দেশে

সে মরতে এলো কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, এখানে না এলে হয়তো বেঁচে থাকতে থাকতে থুত্থুরে বুড়ো হয়ে যেতো ও,' সায় দিলো হেনরি

কথা বলতে গিয়ে আবার কী যেন ভেবে থেমে গেলো বিল। হাত তুললো চারপাশের নিরেট আঁধারের দেয়ালের দিকে। নিশ্ছিদ্র এই আঁধার ভেদ করে কোনো অবয়ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তবে জ্বলন্ত কয়লার মতো জোড়াজোড়া চোখ নজর এড়াচ্ছে না। থেকে থেকেই একজায়গায় জ্বলে উঠছে একজোড়া চোখ, আবার নিভে গিয়ে জ্বলে উঠছে অন্যখানে।

এদিকে অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠছে কুকুরগুলো। হঠাৎ কোনো আতঙ্ক যেন পেয়ে বসেছে ওদের। ছটোপাটি করতে করতে একটা কুকুর এসে পড়লো আগুনের ওপর। যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়লো কুকুরটা, লোম পোড়ার গন্ধে ভারী হয়ে উঠলো বাতাস। চেঁচামেচির ফলে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলো জোড়াজোড়া চোখ, কুকুরটা শান্ত হতেই এগিয়ে এলো আবার।

'হেনরি, গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার চেয়ে জঘন্য কিনিস বুঝি আর কিছু নেই,' বরফের ওপর লোমের বিছানা আর কম্বল পাততে পাততে বললো বিল।

ফোঁৎ করে উঠে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো হেনরি। তারপর জানতে চাইলো, 'আর ক'টা গুলি আছে আমাদের?'

'তিনটে,' জবাব দিলো বিল। 'আহ্, যদি তিনশোটা থাকতো, মজা দেখাতাম ব্যাটাদের!'

জ্বলন্ত চোখগুলোর উদ্দেশে মুঠো ঝাঁকিয়ে আগুনের পাশে জুতো শুকোতে দিলো ও। তারপর আবার বলে চললো, 'ইস্, ঠাণ্ডাটাও

যদি একটু কমতো ! দু'সপ্তাহ ধরে তাপ নেমে আছে শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রী। তুমি ঠিকই বলেছো, এবারের যাত্রাটা সত্যিই খুব বিশ্রী। শুধু মনে হচ্ছে, যাত্রাটা শেষ হবার সাথে সাথে ফোর্ট ম্যাক-গারিতে আগুনের পাশে বসে তাস খেলবো দু'জনে—হ্যাঁ, এই কথাই ভাবছি আমি।'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লো হেনরি। কিন্তু তন্দ্রা আসতে না আসতেই সাথীর গলার শব্দে জেগে উঠলো ও।

'একটা ব্যাপার আমার কাছে খুবই গোলমেলে ঠেকছে। বজ্জাতটা এসে ভাগের একটা মাছ খেয়ে গেলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য কুকুর-গুলো ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না কেন।'

'সব ব্যাপারেই তুমি একটু বেশি মাথা ঘামাতে শুরু করেছো,' ঘুম-জড়ানো স্বরে বললো হেনরি। 'তুমি তো কখনো এরকম ছিলে না ! এখন চুপ করে শুয়ে পড়ো। সকালে উঠে দেখবে, সমস্ত ভাবনা দূর হয়ে গেছে। পেট খারাপ করেছে তোমার, আর সেজন্যেই গোলমেলে ঠেকছে সবকিছু।'

দেখতে দেখতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো দু'জনেই। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো আগুন, চোখগুলোও হতে লাগলো নিকট থেকে নিকটতর। আরো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো কুকুরের পাল, মাঝে-মধ্যেই দাঁত খিঁচোতে লাগলো চোখগুলোর উদ্দেশে। এক পর্যায়ে এমন চিৎকার জুড়ে দিলো তারা, চমকে উঠে জেগে গেলো বিল। হেন-রির ঘুমের যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যে খুব সাবধানে কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে উসকে দিলো আগুনটা। প্রায় সাথেসাথেই পিছিয়ে গেলো চোখগুলো। দু'হাতে চোখ ঘষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকালো কুকুরগুলোর দিকে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আবার ঢুকে পড়লো কম্ব-

লের ভেতর।

'হেনরি,' ডাকলো সে। 'এই হেনরি!'

'এ তো ঘালিয়ে খেলো,' বিড়বিড় করে উঠলো হেনরি, কি হলো?'

'তেমন কিছু নয়,' জবাব দিলো বিল; 'আবার সাতটা কুকুর দেখলাম। বিশ্বাস করো, এইমাত্র গুনেছি।'

কিছুই বললো না হেনরি, যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সে। পর আবার তলিয়ে গেলো ঘুমের গভীরে।

অবশ্য সকালে ঘুম প্রথমে হেনরিরই ভাঙলো। উঠে বসেই বিলকে ঠেলে তুললো সে। ইতোমধ্যে ছ'টা বাজলেও আলো ফুটতে এখনো তিন ঘণ্টা দেরি। নাশতা তৈরি করতে বসলো হেনরি, ওদিকে বিছানা গুছিয়ে রেঞ্জ প্রস্তুত করতে লাগলো বিল।

'বলো দেখি, হেনরি,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো বিল, াদের কুকুর এখন ক'টা?'

'ছ'টা।'

'ভুল!' বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লো বিল।

'তাহলে ক'টা, সাতটা?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো হেনরির গ

'না, পাঁচটা; একটা কেটে পড়েছে।'

'যত্তোসব!' রাগে চিৎকার করে উঠলো হেনরি, তারপর রান্না ফেলে উঠে এলো কুকুর গুনতে।

'ঠিকই বলেছো, বিল,' গোনা শেষ করে বললো সে। 'মোটাটা পালিয়েছে।'

'গুটিগুটি কয়েক-পা এগোনোর পর বিদ্যুদ্বেগে ছুট লাগিয়েছে, একটা শব্দ পর্যন্ত করেনি।'

'সে সুযোগ পেলে তো,' বললো হেনরি। 'ব্যাটারা আস্ত গিলে খেয়েছে ওকে। তবে একটা কথা বাজি রেখে বলতে পারি, গলা দিয়ে নামার সময় নিশ্চয় মৃদু শব্দ করেছিলো মোটা।'

'বরাবরই একটু বোকা ছিলো কুকুরটা,' বললো বিল।

'যতো বোকাই হোক, জেনেশুনে আত্মহত্যা করার মতো বোকামি কুকুরদের পোষায় না,' দলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো হেনরি। 'অন্য কোনো কুকুর এরকম কাণ্ড করতো না।'

'লাঠিপেটা করলেও আর কেউ আগুনের কাছ থেকে নড়বে না,' বললো বিল। 'মোটাটার চালচলনই ছিলো অন্যরকম।'

শেষ হয়ে গেলো মোটা কুকুরটার অধ্যায়। অন্য কোথাও কোনো কুকুর মারা গেলে হয়তো তা নিয়ে কিছু হা-হুতাশ করতো তার প্রভু, কিন্তু সুমেরুর পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।

দুই

মার্দি নেকড়ে

চুপচাপ নাশতা সেরে তাঁবু গুটিয়ে নিলো দু'জনে। বাইরে তখনো গা অন্ধকার। যাত্রা শুরু করতে না করতেই চারপাশ থেকে আবার জেগে

উঠলো সেই ক্ষুধার্ত চিৎকার। সাথে সাথে কথা বন্ধ হয়ে গেলো দু'-জনের। দিনের আলো ফুটলো ন'টার সময়। বারোটার দিকে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো গোলাপী একটা আভা। কিন্তু সেটাও খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। তিনটে বাজতে না বাজতেই দিনের ধূসর আলো হটিয়ে দিয়ে নেমে আসতে লাগলো মেরুরাত্রির ছায়া।

আঁধার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আবার শুরু হলো সেই চিৎ-কার। ডানে বাঁয়ে পেছনে। ক্রমে সে চিৎকার এগিয়ে এলো এতো কাছে, কেঁপেকেঁপে উঠতে লাগলো কুকুরগুলো।

বিল বললো, 'শয়তানগুলো যদি শিকারের খোঁজে অন্য কোথাও যেতো, হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।'

'সত্যি, ব্যাটাদের চিৎকার যেন বুকের রক্ত হিম করে দেয়,' সহানু-ভূতি ঝরে পড়লো হেনরির কণ্ঠে।

তাঁবু খাটানোর আগ পর্যন্ত আর কোনো কথা হলো না।

রান্না করতে বসে মটরশুঁটির পাত্রে কেবল বরফ মিশিয়েছে হেনরি, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো একটা আঘাতের শব্দ, সেইসাথে বিলের চিৎকার আর একটা কুকুরের আর্তনাদ। চমকে উঠে সামনে তাকাতেই সে দেখলো, অস্পষ্ট একটা অবয়ব মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধ-কারের বুকে। এবার তার চোখ পড়লো বিলের দিকে। কুকুরগুলোর মাঝে কিছুটা গর্ব, কিছুটা হতাশা মেশানো মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে, একহাতে একটা গদা, অন্যহাতে লেজসুদ্ধ একটা স্যামনের টুকরো।

'চুপচাপ এসে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে শয়তানটা,' বললো বিল; 'তবে ফলও পেয়েছে হাতে হাতে। বাড়ি একখানা যা কষিয়েছি না, চিৎকারটা শুনেছো নিশ্চয়?'

'চেহারাটা কেমন?' জানতে চাইলো হেনরি।

'ভালোভাবে দেখতে পাইনি। তবে চারটে পা, মুখ আর গ শরীর মিলিয়ে কুকুরের মতোই।'

'বোধ হয় পোষা কোনো নেকড়ে হবে।'

'পোষা না ছাই, খাবার সময় চুপি চুপি এসে মাছ চুরি করার ব্যাপারে ব্যাটা ওস্তাদ।'

রাতে খাবার পর কফিনের ওপর বসে যখন পাইপ ধরালো ওরা, জ্বলন্ত চোখগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একেবারে কাছে।

'উহু! একপাল মুজ কিংবা অন্য আর কিছুর লোভে শয়তানগুলো যদি আমাদের পিছু ছাড়তো!' বললো বিল।

অস্ফুট একটা শব্দ করলো হেনরি, কিন্তু তাতে সহানুভূতি প্রকাশ পেলো কি না, ঠিক বোঝা গেলো না। তারপর মিনিট পনেরো নিঃশব্দে বসে রইলো দু'জন। হেনরি চেয়ে রইলো আগুনের দিকে, বিল দেখতে লাগলো অন্ধকারের বুকে ফুটে ওঠা জোড়াজোড়া চোখ।

'ইতোমধ্যে যদি আমরা ম্যাকগারিতে পৌঁছে যেতে পারতাম!' নিস্তব্ধতা ভাঙলো বিল।

'থামবে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠলো হেনরি। 'সত্যিই পেট খারাপ হয়েছে তোমার, তাছাড়া এতো আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসতো না। এক চামচ সোডা খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে বিলের চিৎকারে ঘুম ভাঙলো হেনরির। কনুইয়ে ভর দিয়ে চোখ মেলতেই সে দেখলো, কুকুরগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-হাত আস্ফালন করে বিল একনাগাড়ে গালি দিয়ে চলেছে ঈশ্বরকে।

'আবার কি হলো?' জানতে চাইলো হেনরি।

'ব্যাণ্ডটাও গেছে, বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে এতোক্ষণে,' জবাব

দিলো বিল।

'না, না, তা হতে পারে না।'

'তা-ই হয়েছে।'

কম্বল ঠেলে ফেলে লাফিয়ে উঠলো হেনরি, দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়ালো কুকুরগুলোর কাছে। তারপর সেগুলো গুনে নিষ্ঠুর এই মেরুরাজ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে যোগ দিলো বিলের সাথে।

'দলের মধ্যে ব্যাঙটাই ছিলো সবচেয়ে শক্তিশালী,' অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো বিল।

'চালাকও ছিলো যথেষ্ট,' বললো হেনরি।

দু'দিনে শেষ হয়ে গেলো দু'টো কুকুরের অধ্যায়।

বিষণ্ণ মনে নাশতা সারলো দু'জনে, তারপর অবশিষ্ট চারটে কুকুরকে জুড়লো স্লেজের সাথে। দিন কাটতে লাগলো গত দু'টো দিনের মতোই। জমাট বরফের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো তারা। চারপাশের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, কেবল মাঝেসাঝে সে স্তব্ধতা খানখান্ হয়ে যাচ্ছে অনুসরণকারীদের চিৎকারে। বিকেল গড়িয়ে যাবার আগেই নেমে এলো রাত, সেইসাথে যথারীতি এগিয়ে এলো অনুসরণকারীর দল। ভয়ে ছটফট করতে লাগলো কুকুরগুলো, আর তাই দেখে হতাশ হয়ে পড়লো দু'জনেই।

'ব্যাস, এবার আর বোকাগুলো পালাতে পারবে না,' সে-রাতে কাজ শেষ করে ঘোষণা দিলো বিল।

রান্না ফেলে এসে দাঁড়ালো হেনরি। দেখলো, তার সঙ্গীটি ভারতীয় কায়দায় কুকুরগুলোকে বেঁধেছে খোঁটার সাথে। গলায় বেল্টগুলোও এতো খাটো করে দিয়েছে যে, দাঁতের নাগালে আসবে না কিছুতেই।

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজের প্রশংসা করলো সে। বললো, 'হ্যাঁ, একমাত্র

এভাবেই কানকাটাটাকে আটকানো সম্ভব। ওর ছুরির মতো ধারালো দাঁতের সামনে কোনো চামড়াই কুলোবে না। আশা করি কাল সকালে সবগুলোকেই ভালোভাবে পাবো।'

'সে-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো,' বললো বিল। 'এরপরেও যদি কোনোটা হারিয়ে যায়, কাল সকালে কফিই খাবো না।'

'শয়তানগুলো কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছে, গুলি ফুরিয়ে এসেছে আমাদের,' শুতে শুতে বললো হেনরি। 'প্রত্যেক রাতেই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে ওরা। অথচ কয়েকটাকে শেষ করতে পারলে আর এতো কাছে আসার সাহস পেতো না। দেখেছো, দেখেছো, একটা প্রায় আগুনের ওপরে এসে পড়েছে!'

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে উঠলো ওরা। চিৎকার করছে কানকাটাটা, সেইসাথে শুরু হয়েছে লাফঝাঁপ। বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে কেন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে কুকুরটা।

দু'জনেই বুঝতে পারলো, চুপিসারে যে প্রাণীটা এসে দাঁড়িয়েছে আগুনের ধারে, ওটার কাছে যাবার জন্যেই কুকুরটার এতো আগ্রহ।

'ওই দেখো,' ফিসফিস করে বললো বিল।

আগুনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কুকুরের মতো একটা প্রাণী। তার হাবভাবে ফুটে আছে একাধারে সন্দেহ আর দুঃসাহস। কুকুরদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও দু'জন মানুষের উপস্থিতি সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন।

'বোকা কানকাটাটার মধ্যে তো ভয়ের কোনো লক্ষণ দেখছি না,' আবার ফিসফিস করে উঠলো বিল।

'ওটা একটা মাদি নেকড়ে,' গলা নামিয়ে বললো হেনরি, 'ওই শয়তানীটাই মোটা আর ব্যাঙের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। নেকড়ের দলটা

ওকে ব্যবহার করে টোপ হিসেবে। কুকুরগুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যায় ওটা, তারপর সাবাড় করে সবাই মিলে।'

প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এলো অগ্নিকুণ্ড থেকে, খসে পড়লো কাঠের গুঁড়ির একটা অংশ। চমকে উঠে নেকড়েটা মিলিয়ে গেলো গাঢ় অন্ধকারে।

'হেনরি, একটা কথা মনে হচ্ছে আমার,' বললো বিল।

'কি কথা?'

'মনে হচ্ছে, আজ সকালে এটাকেই গদা দিয়ে পিটিয়েছিলাম।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' সায় দিলো হেনরি।

'কিন্তু আগুনকে ভয় না পাওয়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক।'

'হুঁ, নেকড়ে কিন্তু ঠিক খাবার সময় কুকুরদের দলে ঢুকে পড়ে—এটা কী করে হয়?'

'আমাদের গ্রামের ভিলান বুড়োর একটা কুকুর ভিড়ে গিয়েছিলো নেকড়েদের সাথে। একদিন নেকড়ে ভেবে গুলি করে মারলাম সেটাকে। মৃতদেহ দেখে বুড়োর সে কি কান্না। তিন বছর ধরে কুকুরটা নাকি নেকড়ের দলেই ছিলো।'

'তোমার সন্দেহ মিথ্যে নয়, বিল। ওটা কুকুরই, নেকড়ে নয়। মানুষের হাত থেকে মাছ খাওয়ার অভ্যেস আছে ওটার।'

'কুকুর হোক কিংবা নেকড়েই হোক, ওটাকে খতম করতেই হবে,' বললো বিল। 'আর কুকুর হারানোর ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

'কিন্তু গুলি তো আছে মোটে তিনটে।'

'ওটাকে শেষ করতে একটা গুলিই যথেষ্ট।'

পরদিন সকালে উঠে যথারীতি নাশতা তৈরি করতে বসলো হেনরি। বিল তখনো নাক ডাকাচ্ছে।

শেষমেষ ওকে জাগিয়ে হেনরি বললো, 'আরো আগেই ডাকতাম, হোয়াইট ফ্যাং

কিন্তু যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, তাড়াহুড়ো করতে মন চাইলো না।'

খেতে শুরু করলো বিল, ঘুমের রেশ তখনো কাটেনি। নাশতা শেষ হতে খেয়াল করলো, শূন্য পড়ে আছে কফির পেয়ালা। কেটলির জন্যে হাত বাড়ালো সে, কিন্তু কেটলি তার নাগালের বাইরে।

'কি ব্যাপার, হেনরি, আজ কফি দিতে ভুলে গেলে নাকি?' শূন্য পেয়ালা দেখিয়ে বললো বিল।

'না, ভুলিনি। কিন্তু কফি তুমি পাবে না।'

'ফুরিয়ে গেছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো বিল।

'না।'

'ভাবছো, কফি খেলে আমার বদহজম হবে?'

'সেরকম কিছু ভাবিনি।'

এবারে সত্যিই রেগে গেলো বিল।

'তাহলে দয়া করে বলবে কি, কেন কফি পাবো না?'

'চট্‌পটেটাও গেছে।'

ওখানে বসে বসেই ঘাড় ঘুরিয়ে কুকুর গুনলো বিল। তারপর সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ গলায় জানতে চাইলো, 'কিভাবে ঘটলো ব্যাপারটা?'

কাঁধ ঝাঁকালো হেনরি। 'জানি না। হয়তো কানকাটাটাই বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছে, ওর তো আর সে শক্তি ছিলো না।'

'শয়তান!' ভেতরে বেড়ে ওঠা রাগ একটুও প্রকাশ পেলো না বিলের কণ্ঠে। 'নিজেরটা না পারলেও অন্যের বাঁধন ঠিকই কেটে দিয়েছে।'

'এসব বলে আর কী লাভ? চট্‌পটে এখন টুকরো টুকরো হয়ে শুয়ে আছে বিশটা নেকড়ের পেটে। তার চেয়ে ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে—এই নাও কফি।'

মাথা ঝাঁকালো বিল।

'আরে নাও তো,' কেটলিটা আরো এগিয়ে দিলো হেনরি।

কিন্তু বিল কফির পেয়ালা সরিয়ে রাখলো একপাশে। 'না। আমি বলেছিলাম, যদি আর একটা কুকুরও হারায়, তাহলে কফি খাবো না। সুতরাং খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কফিটা কিন্তু দারুণ হয়েছে,' লোভ দেখালো হেনরি।

তবু গোঁ ছাড়লো না বিল. নাশতার থালা পরিষ্কার করতে করতে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে চললো কানকাটাটাকে।

তারপর যাত্রা শুরু করার ঠিক আগে বললো, 'আজ ওগুলোকে এমনভাবে বাঁধবো, যাতে কেউ কারো নাগাল না পায়।'

একশো গজ যেতে না যেতেই কিছু একটার ধাক্কা লাগলো হেনরির জুতোর সাথে। নিচু হয়ে সে তুলে নিলো জিনিসটা। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও স্পর্শ করেই সে বুঝতে পেরেছে ওটা কী। জিনিস-টা ছুঁড়ে দিলো সে, স্লেজের সাথে টক্কর খেয়ে সেটা গিয়ে পড়লো বিলের জুতোর সামনে।

'রেখে দাও, তোমার অনেক কাজে লাগবে,' বললো হেনরি।

একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো বিলের গলা দিয়ে। জিনিসটা আর কিছু নয়—একটা থোঁটা। গত রাতে এই থোঁটার সাথেই সে বেঁধে-ছিলো চটপটে কুকুরটাকে।

'হাড়, চামড়া কিছু আর বাদ রাখেনি শয়তানগুলো,' মন্তব্য করলো বিল। 'থোঁটায় গায়ে লেগে থাকা রক্তগুলোও চেটেপুটে খেয়েছে। খিদেয় ওরা ছটফট করছে, হেনরি, শেষপর্যন্ত হয়তো আমাদেরও ছাড়বে না।'

বাঁকা একটা হাসি ফুটে উঠলো হেনরির ঠোঁটে। 'এর আগে

কখনো নেকড়ের পাল্লায় পড়িনি সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো বিপদের মুখোমুখি হয়েও বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছি। সুতরাং এই ক'টা নেকড়ে আমাদের ঘায়েল করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কী হবে, কে জানে!' বিড়বিড় করে বললো বিল।

'ম্যাকগারিতে পৌঁছুলেই সব বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু পৌঁছুতে পারলে হয়!'

'শরীরটা সত্যিই খারাপ হয়েছে দেখছি। এখন একটা জিনিসই তোমার দরকার—কড়া এক ডোজ কুইনাইন। ম্যাকগারিতে পৌঁছেই সেটার ব্যবস্থা করবো।'

ঘোঁৎ করে উঠলো বিল, যেন ওষুধটা তার পছন্দ হয়নি, তারপরই চুপ করে গেলো। গত কয়েক দিনের মতোই আলো ফুটলো নটায়; বারোটায় দক্ষিণ দিগন্ত কিছুটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অদৃশ্য সূর্যের আলোয়; আর তার পরপরই ধূসর বিকেলের শুরু, মাত্র তিন ঘণ্টা পরেই যে বিকেল মিলিয়ে যাবে রাত্রির অন্ধকার গহ্বরে।

আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করতে করতে যখন হাল ছেড়ে দিলো সূর্য, ঠিক তখনই স্লেজ থেকে রাইফেলটা তুলে নিলো বিল।

বললো, 'তুমি এগিয়ে যাও, হেনরি, আমি একটু চারপাশটা ঘুরে দেখি।'

'স্লেজের কাছ থেকে সরে যাওয়াটা উচিত হবে না তোমার,' আপত্তি জানালো হেনরি। 'মনে রেখো, মাত্র তিনটে গুলিই আমাদের সম্বল। বিপদও বলে-কয়ে আসে না।'

'ওয় তাহলে তুমিও পাও? তাহলে আর তখন অতো বড়ো বড়ো কথা বলছিলে কেন?' বিদ্রূপ ঝরে পড়লো বিলের কণ্ঠে।

আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চললো হেনরি। কিন্তু মাঝে-মাঝেই

শঙ্কিতদৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো পেছনদিকে।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে বিল বললো, 'শয়তানগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, কিন্তু অনুসরণ করা ছাড়েনি। আমাদের পাশাপাশি খাওয়ার যোগ্য কোনো শিকারের সন্ধান করে চলেছে ওরা। আসলে, আমাদের পাওয়া যে শুধু সময়ের ব্যাপার, সেটা ওরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমাদের যে সহজেই পাওয়া যাবে, এই কথাটা ওরা ভেবেছে। আজকাল দেখছি জন্তুজানোয়ারেরাও কল্পনা করতে পারে!'

ইচ্ছে করেই হেনরির এই বিদ্রূপটা এড়িয়ে গেলো বিল। 'ওদের কয়েকটাকে নিজের চোখেই দেখলাম। হাড় জিরজিরে চেহারা। এক-নজরেই বোঝা যায়, মোটা, ব্যাঙ আর চটপটে ছাড়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওদের পেটে কিছু পড়েনি। খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে যাওয়াটাও এখন ওদের পক্ষে বিচিত্র নয়।'

কয়েক মিনিট পর মেজের পেছনদিক থেকে শিস দিয়ে উঠলো হেনরি। মাথা ঘুরিয়েই কুকুরগুলোকে থামিয়ে দিলো বিল। এইমাত্র যে বাঁকটা ওরা পেরিয়ে এলো, সেদিক থেকেই এগিয়ে আসছে লোমশ একটা প্রাণী। তাদের থামতে দেখে থেমে দাঁড়ালো ওটাও, নাক তুলে গন্ধ নিলো বাতাসে।

'সেই মাদি নেকড়েটা,' ফিসফিস করে বললো বিল।

ভীষণ পরিশ্রান্ত কুকুর তিনটে ইতোমধ্যেই শুয়ে পড়েছে বরফের ওপর। ধীরে ধীরে হেনরি গিয়ে দাঁড়ালো বিলের পাশে, তারপর দু'জনে মিলে দেখতে লাগলো নেকড়েটাকে।

বেশ কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে ওদের লক্ষ্য করার পর কয়েক ধাপ

এগিয়ে এলো শয়তানটা। এভাবে থেমে থেমে কয়েকবার এগোনোর পর ওটা পৌঁছে গেলো একশো গজের মধ্যে। একসারি দেবদারু গাছের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। ওটার চাহনি প্রায় কুকুরদের মতোই নরম, কিন্তু সে চাহনিতে কুকুরের ভালোবাসার কোনো চিহ্ন নেই। বরং ওই চাহনির আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা, যে ক্ষুধা ওর দাঁতের মতোই নিষ্ঠুর, মেরুরাজ্যের বরফের মতোই নির্মম।

শীর্ণ হলেও নেকড়েটা যথেষ্ট বড়ো।

'মাটি থেকে কাঁধের উচ্চতা হবে আড়াই ফুট,' মন্তব্য করলো হেনরি। 'আর বাজি রেখে বলতে পারি, দৈর্ঘ্যেও পাঁচ ফুটের খুব একটা কম হবে না।'

'গায়ের রঙটাও অদ্ভুত,' বললো বিল। 'লাল রঙের নেকড়ে জীবনে দেখিনি, ঠিক যেন দারুচিনি।'

আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। এটাই নেকড়েদের খাঁটি রঙ। লালাভ একটা ভাব থাকলেও ধূসর রঙটাই প্রধান। তাছাড়া দু'টো রঙ এমন-ভাবে মিশে আছে যে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিভ্রম হয়। থেকেই মনে হয় ওটার রঙ ধূসর, থেকেই মনে হয় লালাভ।

'ওটাকে বড়ো একটা হাস্কিই মনে হচ্ছে, লেজ নাড়ালেও অবা হবো না,' বললো বিল।

তারপর একটু থেমে ডাক দিলো, 'এই হাস্কি, এদিকে আয়!'

'দেখলে, তোয়াক্কাই করলো না,' হেসে উঠলো হেনরি।

এবার হাত তুলে চেঁচাতে লাগলো বিল, তবু ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না জানোয়ারটার মধ্যে। সে ক্ষুধার্ত, ওর চোখে তাই দু'জন মানুষ আর তিনটে কুকুর মাংসের মজুত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওদের মাংসে পেটে পোরার ব্যাপারে ইচ্ছের কোনো াব নেই নেকড়েটার, অভাব শুধু সাহসের।

'শোনো, হেনরি,' গলা নামিয়ে বললো বিল। 'ব্যাটা আমাদের তিনটে কুকুরকে খতম করেছে, সুতরাং ওটাকেও খতম করা আমাদের কর্তব্য। গুলি আমাদের তিনটে আছে বটে, কিন্তু একটার বেশি খরচ করতে হবে না। এখন বলো, তোমার কি মত?'

হেনরি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই আস্তে করে রাইফেলটা তুলে নিলো বিল। কিন্তু কুঁদোটা কাঁধে ঠেকানোর আগেই এক লাফে মাদি নেকড়েটা অদৃশ্য হয়ে গেলো দেবদারু গাছের আড়ালে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো দু'জনে। তারপর সবজান্তার ভঙ্গিতে লম্বা শিস দিলো হেনরি।

'ব্যাপারটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিলো,' রাইফেলটা রাখতে রাখতে গলা চড়ালো বিল। 'যে নেকড়ে কুকুরের খাবার সময় জানে, সে রাইফেল সম্বন্ধেও জানে। তবে ওকে আমি ছাড়ছি না। কারণ ও-ই যতো গণ্ডগোলের মূল। ফাঁকা জায়গায় ওকে কায়দা করা যাবে না, কিন্তু আড়াল থেকে ঠিকই মারবো।'

'খুব বেশি দূরে যাওয়াটা উচিত হবে না,' সতর্ক করে দিলো হেনরি। 'হঠাৎ যদি নেকড়ের দলের মধ্যে গিয়ে পড়ো, তিনটে গুলি কোনো কাজেই লাগবে না।'

সে-রাতে একটু আগেভাগেই খাটানো হলো তাঁবু। কারণ দীর্ঘক্ষণ চলার মতো শক্তি কুকুরগুলোর আর নেই। শোবার আগে বিল ওদের এমনভাবে বাঁধলো, যাতে কেউ কারো নাগাল না পায়।

ওদিকে মরিয়া হয়ে উঠেছে নেকড়েগুলো। ওরা যাতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, সেজন্যে বারবার ঘুম থেকে উঠে উসকে দিতে হলো আগুন।

'নাবিকদের মুখে শুনেছি, হাঙরের দল নাকি কখনো কখনো অনুসরণ করে জাহাজকে,' কম্বলের নিচে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠলো বিল। 'আর এই নেকড়েগুলো হচ্ছে ডাঙার হাঙর। শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই আমাদের।'

'অযথা বকবক করো না।' ধমকে উঠলো হেনরি। 'কথা শুনে মনে হচ্ছে, ইতোমধ্যেই তোমার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে নেকড়েরা। অতো ঘাবড়ে গেলে চলে?'

'আমাদের চেয়ে অনেক সাহসী লোকেরাও নেকড়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি।'

'তুমি থামবে?'

রাগে গরগর করতে করতে শুয়ে পড়লো হেনরি। কিন্তু বিলের নির্লিপ্তভাব ভীষণ অবাক করলো ওকে। কেউ মেজাজ দেখালে তো চুপ করে থাকার পাত্র নয় বিল। ঘুমোবার আগে অনেকক্ষণ সে ভাবলো এ-বিষয়ে। অবশেষে চোখের পাতা বন্ধ করে মনে মনে বললো: 'উঁহুঁ, এতো ঘুষড়ে পড়া কোনো কাজের কথা নয়। যেভাবেই হোক, আগামীকাল ওকে চাঙ্গা করে তুলতেই হবে।'

তিন

ক্ষুধার আর্তনাদ

ভালোভাবেই শুরু হলো দিনটা। গত রাতে কোনো কুকুর হারিয়ে যায়নি, বিলও তার মনমরা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে রসিকতা শুরু করেছে কুকুরগুলোর সাথে। কিন্তু দুপুরে ঘটলো দুর্ঘটনা।

উল্টে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি আর বিশাল একখণ্ড পাথরের মাঝখানে আটকা পড়লো স্লেজটা। কুকুরগুলোর বাঁধন খুলে দিয়ে স্লেজটা সোজা করার চেষ্টায় রত হই। দু'জনে। আর ঠিক তখনই হেনরির চোখে পড়লো, চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছে কানকাটাটা।

'এই, এই শয়তান!' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

কিন্তু কানকাটাটা ততোক্ষণে দৌড়োতে শুরু করেছে তাদের ফেলে আসা পথের ওপর দিয়ে। মাদি নেকড়েটার কাছাকাছি পৌঁছুতে একটু সতর্ক হয়ে উঠলো সে। গতি কমিয়ে দিলো প্রথমটায়, তারপর একেবারে থেমে গেলো। দাঁত বের করলো নেকড়েটা। কিন্তু ভয় দেখানোর জন্যে নয়, যেন নতুন অতিথিকে সে একটা হাসি উপহার দিতে চায়। খেলাচ্ছলে কুকুরটার দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে এলো সে। সতর্ক দৃষ্টি

বজায় রেখে, লেজ খাড়া করে এগিয়ে গেলো কানকাটাটাও।

কিছুক্ষণ খেলা করলো দু'জনে। তারপর যতোই এগিয়ে গেলো কানকাটা, ততোই পিছোতে লাগলো নেকড়েটা। বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর পেছন ফিরে উল্টোনো স্লেজ, দুই সঙ্গী আর দু'জন মানুষের দিকে তাকিয়ে রইলো কানকাটা।

সে যা করছে, তা ঠিক হচ্ছে না—এরকম একটা কথা হয়তো উদয় হলো ওর মনে। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যেই। ভালোমন্দের ভাবনার চেয়ে ওই মাদি নেকড়ের আকর্ষণ অনেক বেশি।

ইতোমধ্যে বিলের মনে পড়েছে রাইফেলটার কথা। কিন্তু সেটা আবার চাপা পড়েছে স্লেজের নিচে। হেনরির সাহায্যে সে যখন রাই-ফেলটা বের করে আনলো, কানকাটা আর মাদি নেকড়েটা ততোক্ষণে এতো দূরে চলে গেছে যে, গুলি লাগানো অসম্ভব।

একেবারে শেষমুহূর্তে টনক নড়লো কানকাটার। ঘুরে স্লেজের দিকে দৌড়োতে লাগলো সে। প্রায় সাথে সাথে যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো গোটা বারো নেকড়ে, ছুটতে লাগলো কানকাটার দিকে। ওদিকে এতোক্ষণের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে মাদি নেকড়েটার আসল চেহারা। চোখের পলকে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো কানকাটার ওপর। কাঁধের ধাক্কায় নেকড়েটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, গতিপথ বদলে স্লেজের কাছে আসার একটা শেষ চেষ্টা করলো কানকাটা, কিন্তু তার আগেই ওর পথরোধ করে দাঁড়ালো নেকড়ের দল।

'তুমি আবার কোথায় চললে?' বিলের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলো হেনরি।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিলো বিল। 'অসহ্য!' বললো সে। 'শয়তানগুলো প্রত্যেকদিন আমাদের একটা করে কুকুর খেয়ে যাবে,

আর আমরা বসে বসে আঙুল চুষবো !'

পথের পাশে ঝোপের ভেতরে ঢুকে পড়লো বিল। ওর মনো বি একদম পরিষ্কার। নেকড়েগুলোকে ভয় দেখিয়ে কুকুরটাকে উদ্ধার করতে চায় সে। দিনের আলোয় কাজটা একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে।

'বিল !' পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো হেনরি। বিধান ! অযথা গুলি নষ্ট করো না !'

স্লেজের ওপর বসে পড়লো সে। এই মুহূর্তে তার আর কিছু করার নেই। বিল ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেও ঝোপঝাড় আর দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে ওকে। ওদিকে কানকাটা-টাকে মাঝখানে রেখে ধীরে ধীরে বৃত্ত ছোট করে আনছে নেকড়ের দল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হেনরির মনে হলো, অতোগুলো বুভুক্ষু নেকড়েকে এড়িয়ে কানকাটাটা কোনোমতেই স্লেজের কাছে এসে পৌছুতে পারবে না।

হঠাৎ একটা চিন্তা খাড়া করে দিলো ওর শিরদাঁড়া। ঝোপঝাড়ের আড়ালে কখনো না কখনো নিজের অজান্তেই বিলকে মুখোমুখি হতে হবে নেকড়েদের। এবং প্রায় তখনই ঘটলো কাণ্ডটা। ভেসে এলো একটা গুলির শব্দ, খানিক পরেই আবার পরপর দু'বার। গুলি শেষ— কথাটা মনে হতেই কেঁপে উঠলো হেনরির অন্তরাত্মা। আর ঠিক তখনই শোনা গেলো নেকড়েদের মিলিত গর্জন। ভীষণ সেই গর্জনের ফাঁকে যুগপৎ আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো কানকাটা, ককিয়ে উঠলো একটা আহত নেকড়ে। তারপরই সব চুপ।

অনেকক্ষণ ধরে পাথরের মূর্তির মতো স্লেজের ওপর বসে রইলো হেনরি। কিছুই দেখতে পায়নি সে, কিন্তু বুঝতে বাকি নেই, কী ঘটেছে ওখানে। একবার উঠে স্লেজের গায়ে বাঁধা কুড়োলটা খুলে নিলো সে,

কিন্তু কি ভেবে বসে পড়লো আবার।

আরো অনেকক্ষণ পর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো হেনরি। কুকুর-দু'টোকে জুড়ে দিয়ে ওদের সাথে নিজেও টানতে লাগলো স্লেজ। সন্ধ্যা নামার সাথেসাথে তাঁবু খাটালো সে, তারপর বিরাট এক অগ্নি-কুণ্ড জেলে শুয়ে পড়লো তার পাশে।

কিন্তু বিশ্রাম ওর ভাগ্যে নেই। ধীরে ধীরে অগ্নিকুণ্ডের একেবারে কাছে এসে পৌঁছুলো নেকড়ের দল। কেউ বসে রইলো, কেউ শুয়ে পড়লো, কেউ এগিয়ে এলো গুঁড়ি মেরে, কেউ পায়চারি করতে লাগলো, এমনকি বরফের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েও পড়লো কয়েকটা। আজ তার চোখে ঘুম না থাক-লেও ঘুমোতে বাধা নেই নেকড়েদের।

আগুনটা যাতে একটুও কমে না আসে, সেদিকে কড়া নজর রাখলো হেনরি। কারণ এখন ওই আগুনের উজ্জ্বলতার ওপরেই নির্ভর করছে ওর জীবন। দু'পাশ থেকে মাঝে মাঝে চিৎকার দিয়ে উঠছে কুকুর-দু'টো, তখন সামান্য পিছিয়ে যাচ্ছে নেকড়ের দল।

কিন্তু এগিয়ে আসার প্রবণতাটা ওদের কিছুতেই কমছে না। অত্যন্ত ধীরে, এক-পা এক-পা করে হলেও এগিয়ে আসছে ওরা। এক পর্যায়ে এতো কাছে পৌঁছুলো যে আর একটা লাফ দিলেই গিয়ে পড়বে হেন-রির ওপর। উপায়ান্তর না দেখে কিছুক্ষণ পরপর জ্বলন্ত কাঠের টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগলো সে। বেশির ভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কিন্তু যেবার হলো না, ককিয়ে উঠলো কোনো একটা নেকড়ে।

অবশেষে চরম দুঃস্বপ্নের সেই রাত কেটে গিয়ে এলো ভোর। অন্ধ-কারের মধ্যেই নাশতা তৈরি করে খেয়ে নিলো সে। ন'টায় দিনের আলো ফুটতে পিছিয়ে গেলো নেকড়েরা। এবার সারারাত ধরে যে

পরিকল্পনাটা এঁটেছে, সেই অনুযায়ী, কাজ করতে লাগলো সে। প্রথমে কয়েকটা চারাগাছ কেটে একটা মাচান তৈরি করলো, তারপর মাচানের ওপর কফিনটা রেখে দড়ির সাহায্যে তুলে দিলো গাছের একেবারে মগডালে।

বললো, 'শয়তানের দল বিলকে সাবাড় করেছে, হয়তো আমাকেও খতম করবে, কিন্তু তোমার গায়ে কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করে গেলাম।'

আবার শুরু হলো যাত্রা। স্লেজটা হালকা পেয়ে ছুটতে লাগলো কুকুর দু'টো। ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে, ফোর্ট ম্যাকগারিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়। ওদিকে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নেকড়ের দল। আর কোনো লুকোচুরি নেই, তেড়ে আসছে ওরা হাড়সর্বস্ব চেহারা, লকলক করে ঝুলছে টকটকে লাল জিভ।

সন্ধ্যে পর্যন্ত চলার সাহস হলো না হেনরির। দুপুরে একটু উঁকি দিয়ে সূর্য যদিও জানালো, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকের দিনটা বড়ো হতে যাচ্ছে, তবু বেশি চলার উপায় নেই তার। ওই বাড়তি সময়টুকুকেই কাজে লাগাতে হবে। সংগ্রহ করতে হবে জ্বালানীকাঠ।

আবার নেমে এলো ভয়াবহ রাত। এবার নেকড়েগুলোই শুধু মরিয়া হয়ে উঠলো না, দু'চোখ মেলে রাখাও কঠিন হয়ে পড়লো হেনরির। কাঁধে কম্বল, দু'হাঁটুর মাঝখানে কুড়োল রেখে ঢুলতে লাগলো সে, কুকুর দু'টো সেঁটে রইলো দু'পাশে। একবার চমকে জেগে উঠে সে দেখলো, হাত আষ্টেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক নেকড়ে। তাকে চোখ মেলতে দেখে একটুও ভড়কালো না জানোয়ারটা। হাই তুললো অলস কুকুরের মতো, তারপর হাত-পা টানটান করে তাকালো পরিপূর্ণ চোখে। যেন বলতে চায়, 'ইচ্ছে করলেই আমরা তোমাকে খেতে

পারি, একটু দেরি করছি এই যা।'

দলের সব নেকড়েই যেন এ-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। তাই কয়েকটা চেয়ে রইলেও ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকগুলো। খাবারভর্তি টেবিল মাঝখানে রেখে যেন অনুমতির অপেক্ষা করছে একদল শিশু।

আগুন উসকে দিতে গিয়ে হেনরির চোখ পড়লো নিজের হাতের ওপর। আঙুলগুলো মুঠো করলো সে, তারপর আবার মেলে দিলো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো নখের ডগা। মনে হলো, এই হাত, আঙুল, আপন ছন্দে কাজ করে চলা মাংসপেশিগুলোকে সে যেন কখনোই ভালো করে দেখেনি। নিজের শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিমোহিত হয়ে পড়লো হেনরি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই রূঢ় বাস্তব ছুটিয়ে দিলো ঘোর। চমকে উঠে তাকালো সে নেকড়েগুলোর দিকে। ক্ষুধার্ত ওই জানোয়ারগুলোর কাছে তার চমৎকার এই শরীর মাংসের একটা স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের চোখে একটা মুজ কিংবা খরগোশের সাথে কোনো পার্থক্য নেই তার।

নিজের অজান্তেই আবার কখন যেন তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো হেনরির। এবার জেগে উঠতে হাত চারেক সামনে সে দেখতে পেলো মাদি নেকড়েটাকে। নরম চোখে চেয়ে রয়েছে জানোয়ারটা, কিন্তু খোলা মুখ দিয়ে ঝড়ে পড়ছে লালা।

একটা কাঠ তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো সে, কিন্তু তার আগেই লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেলো নেকড়েটা। আবার নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকালো সে। কতো কৌশলেই না তারা জড়িয়ে রয়েছে জ্বলন্ত কাঠটাকে, আঁচ লাগার সাথে সাথে একটা আঙুল সরে গেলো কাঠের শীতল অংশের দিকে। অথচ এই আঙুলটাই হয়তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে মাদি নেকড়েটার শাদা ঝকঝকে দাঁতের প্রচণ্ড কামড়ে!

আজন্ম পরিচিত এই দেহটাকে তো সে কখনোই এতো ভালোবাসেনি। এমন সময় এলো ভালোবাসা, যখন এর অধিকারই সে হারাতে বসেছে।

সারারাত জলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে সে লড়াই করে গেলো নেকড়ে-গুলোর সাথে। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই নেমে এলো তন্দ্রা, কিন্তু সে-তন্দ্রা টুটে গেলো দু'পাশের দু'টো কুকুরের কানফাটানো চিৎকারে। ভোর হতে সাগ্রহে অপেক্ষা করে রইলো সে, কিন্তু এই প্রথম দিনের আলোও জানোয়ারগুলোকে হটাতে পারলো না।

মরিয়া হয়ে স্লেজ জোড়ার একটা শেষ চেষ্টা করলো সে। কিন্তু আগুনের কাছ থেকে সরতে না সরতেই ঝাঁপ দিলো একটা নেকড়ে। কোনোমতে পেছনে লাফ দিয়ে সে জীবন বাঁচালো বটে, কিন্তু উরুর এক টুকরো মাংস বাঁচাতে পারলো না। দেখাদেখি ছুটে এলো অন্য নেকড়েরা, পাগলের মতো জলন্ত কাঠ ছুঁড়তে লাগলো সে।

দিনের আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পরেও আগুনের কাছ থেকে দূরে যাওয়ার সাহস হলো না ওর। কিন্তু জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করে রাখা দরকার, প্রচুর জ্বালানীকাঠ। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো ওর মাথায়। তাঁবু থেকে ফুট বিশেক দূরেই আছে একটা মরা দেবদারু। খুব ধীরে, সতর্কভাবে তাঁবুটাকে সে নিয়ে এলো গাছের কাছে। তারপর এমনভাবে কাটতে শুরু করলো গাছটা, যেন ওটা তাঁবু ছাড়া আর অন্য কোনোদিকে পড়ে না যায়। শয়তানগুলোকে তাড়াতে হলে অন্তত দু'টা জলন্ত কাঠ সবসময় হাতের কাছে রাখা দরকার।

দিনের শেষে আবার এলো রাত। মাথা সোজা করে রাখাই কঠিন হয়ে উঠলো ওর পক্ষে। সর্বক্ষণ ডেকে চলেছে কুকুর দু'টো, কিন্তু তাদের গলাতেও আর আগের সে-জোর নেই। একবার ঘুম থেকে জেগে উঠে সে দেখলো, মাত্র হাতখানেক সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে

মাদি নেকড়েটা। জ্বলন্ত কাঠের একটা টুকরো তুলে নিলো সে, কিন্তু ছুঁড়ে না মেরে গুঁজে দিলো ওটার খোলা মুখে। আর্তনাদ করে পেছনে লাফিয়ে পড়লো জানোয়ারটা। মাংস আর চামড়া পোড়ার গন্ধে খুশি হয়ে উঠলো ওর মন।

আবার একটা বুদ্ধি করলো সে। দেবদারুর জ্বলন্ত ডাল বেঁধে নিলো হাতের সাথে। আর এতে করে ঘুমিয়ে পড়লেও একসময় তাপ জাগিয়ে তুললো ওকে। কয়েক ঘণ্টা এভাবেই জেগে জেগে উঠে নেকড়েগুলো-কে তাড়ালো সে। তারপর একবার প্রচণ্ড ঘুমের ঘোরে বাঁধনটা ঠিক-মতো হলো না, ফলে একটু পরেই ডালটা খসে পড়লো হাত থেকে।

স্বপ্ন দেখতে লাগলো হেনরি। দেখলো, ফোর্ট ম্যাকগারির ভেতরে বসে তাস খেলছে সে। হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো একপাল নেকড়ে। দরজা আঁচড়াতে আঁচড়াতে গর্জন করতে লাগলো। এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওদের মুখে। তারপরই ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। নেকড়েদের সমবেত আক্রমণে হুড়মুড় করে খসে পড়লো দরজাটা। দলে দলে নেকড়ে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতরে। ক্ষুধার্ত আর্তনাদে তালা লেগে গেলো কানে।

ঘুম ভেঙে গেলো হেনরির। কিন্তু আর্তনাদগুলো যে শোনা যাচ্ছে এখনো! পরক্ষণেই চমকে উঠে সে দেখলো, নেকড়েগুলো ছুটে আসছে তার দিকে। একটা নেকড়ে কামড় বসালো হাতে। সাথে সাথে ঝাঁপ দিলো সে প্রায় আগুনের ওপর, এবার কামড় পড়লো পায়ে। ভারী দস্তানা পরা হাতে মুঠো মুঠো জ্বলন্ত কয়লা তুলে সে ছুঁড়ে মারতে লাগলো চারদিকে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে থাকতে পারলো না ওখানে। প্রচণ্ড তাপে ফোসকা পড়েছে দু'পায়ে, ঝলসে গেছে মুখ, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ভ্রু

আর চোখের পাতা। দু'হাতে দু'টো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আবার সে ঝাঁপ দিলো সামনে। এবার পিছু হটলো নেকড়ের দল। কিছুক্ষণ পর-পর ভেসে আসা ওদের চিৎকারে বোঝা গেলো, পা পড়েছে জ্বলন্ত কয়লার ওপর।

সবচেয়ে কাছের নেকড়েগুলোর দিকে কাঠ দু'টো ছুঁড়ে দিলো হেনরি। তারপর ধূমায়িত দস্তানা দু'টো বরফের ওপর রেখে ঠাণ্ডা করতে লাগলো পা। ইতোমধ্যে উধাও হয়ে গেছে কুকুরদু'টো। মোটাকে দিয়ে যে ভোজনের শুরু, সেটা শেষ হবে এই দু'টোকে দিয়ে, তবে সর্ব-শেষ পদ হিসেবে হয়তো হাজির করতে হবে নিজেকেই

'শয়তানের দল, ওই বোকাগুলোর মতো সহজে পাবি না আমাকে। এই ক'দিনে নিশ্চয় বুঝে গেছিস সেটা।' জানোয়ারগুলোর উদ্দেশে হিংস্রভাবে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচিয়ে উঠলো হেনরি। প্রত্যুত্তরে চেঁচিয়ে উঠলো নেকড়েরাও। সবচেয়ে কাছে এগিয়ে এলো মাদি নেকড়েটা, চোখ দিয়ে চাটতে লাগলো তার সর্বাঙ্গ।

আবারো নতুন একটা বুদ্ধি খেলে গেলো মাথায়। আগুনটার বৃত্ত বড়ো করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে, তারপর ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে শোবার সরঞ্জামগুলো বিছিয়ে দিলো বরফের ওপর। ধীরে ধীরে নেকড়েগুলো এসে বসে পড়লো গোল হয়ে। চোখ মিটমিট করতে লাগলো কুকুরের মতো, হাই তুললো, টানটান করলো পেশি। অবশেষে আকাশের দিকে নাক তুলে আর্তনাদ করতে লাগলো মাদি নেকড়েটা। একে একে নাক তুললো সবাই, আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ক্ষুধার আর্তনাদ।

ধীরে ধীরে একসময় আবার ফুটলো দিনের আলো। নিবুনিবু আগুনটা উসকে দেয়া দরকার, কিন্তু বৃত্তের বাইরেই অপেক্ষা করছে

নেকড়েরা। জ্বলন্ত কাঠের কয়েকটা টুকরো ছুঁড়লো সে, কিন্তু ওগুলো-কেও যেন ওরা আর গ্রাহ্য করতে চায় না। উপায়ান্তর না দেখে তেড়ে গেলো সে, কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। বরং ওকেই আবার ছুটে আসতে হলো আগুনের আশ্রয়ে। ঝাঁপ দিলো অসমসাহসী এক নেকড়ে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে গেলো গন্‌গনে কয়লার ওপর। এক-মুহূর্ত পরেই কানফাটানো চিৎকার করতে করতে ছুটে গেলো বরফের দিকে।

মাথা নিচু করে, গুটিসুটি মেরে কম্বলের ওপর বসে পড়লো হেনরি। ঝুলে পড়লো কাঁধ দু'টো, যেন হাল ছেড়ে দিলো সে। ওদিকে এক-পাশ থেকে ধীরে ধীরে নিবে আসছে আগুন, সেইসাথে তৈরি হচ্ছে নেকড়েদের প্রবেশপথ।

'এখন হয়তো সহজেই আমাকে পেয়ে যাবি তোরা,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'তবু না ঘুমিয়ে আমি আর পারছি না।'

কিছুক্ষণ পর তন্দ্রা কাটতে সে দেখলো, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মাদি নেকড়েটা।

একটু পরেই আবার ভেঙে গেলো ঘুম। কিন্তু ওর মনে হলো, কেটে গেছে কয়েক ঘণ্টা। একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, অদ্ভুত পরিবর্তন, যা ঘুমের শেষ রেশটুকুও উধাও করে দিলো তার চোখ থেকে। তবু প্রথম-টায় বুঝতে পারলো না সে। পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, নেকড়েগুলো নেই।

স্লেজের শব্দ, সেইসাথে মানুষ আর কুকুরের মিলিত চিৎকার ভেসে এলো তার কানে। একসাথে এগিয়ে এলো চারটে স্লেজ, ওদিকে ছ'-জন মানুষ ঝাঁকুনি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করতে চাইছে হেনরিকে—আর সে তখন মাতালের মতো বিড়বিড় করে বলে চলেছে :

'লাল মাদি নেকড়ে·· এসে হাজির হলো কুকুরদের খাবার সময়··· প্রথমে খেলো মাছ···তারপর কুকুরগুলোকে···তারপর বিলকে···'

একজন লোক ওকে সজোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জানতে চাইলো, 'লর্ড আলফ্রেড কোথায় ? বলো, লর্ড আলফ্রেড কোথায় ?'

আস্তে করে মাথা নাড়ালো হেনরি। 'না, শয়তানীটা ওকে খেতে পারেনি···ওকে নিরাপদে ঝুলিয়ে রেখেছি গাছের ডালে।'

'মারা গেছেন নাকি ?' চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা।

'ঝুলিয়ে রেখেছি কব্জিনে করে,' রুদ্ধ গলায় বললো হেনরি। 'এখন যাও সবাই, একা থাকতে দাও আমাকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে··· গুডনাইট।'

দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেলো তার, মাথাটা ঝুলে পড়লো বুকের ওপর। লোকগুলো ওকে ধরাধরি করে কম্বলের ওপর শুইয়ে দেয়ার আগেই নাক ডাকাতে লাগলো সশব্দে।

কিন্তু সেই শব্দ ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ ভেসে এলো অনেক দূর থেকে। চিৎকার করছে নেকড়ের পাল। সদ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়া শিকারটা ফেলে ওরা ছুটে চলেছে নতুন শিকারের সন্ধানে।

চার

দাঁতের লড়াই

সেজ নিয়ে মানুষ এগিয়ে আসার শব্দ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে মাদি নেকড়েটার কানে। কিন্তু তাকে লাফিয়ে পেছনে সরে যেতে দেখেও ইতস্তত করতে থাকে দলটা। আসলে প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে যাওয়া শিকারটাকে ছেড়ে দিতে ওদের মন উঠছিলো না। কয়েক মিনিট পর মানুষের কথা আর কুকুরের চিৎকার পরিষ্কারভাবে শুনতে পেয়ে অগত্যা সরে গেলো ওরা।

দলের পুরোভাগে ছুটে চলেছে বিরাট এক ধূসর নেকড়ে—দলীয় প্রধানদের অন্যতম। তার পেছনে মাদি নেকড়েটা, আর তার পেছনে পেছনে দলের অন্যান্যেরা। মাদি নেকড়েকে গতি বাড়াতে দেখলে গতি বাড়ায় ধূসর নেকড়েটা, আর দলের কমবয়েসী কেউ যদি আগে বাড়তে চায়, হয় দাঁত খিঁচিয়ে সাবধান করে দেয়, নয়তো দেয় কামড়ে।

এতোক্ষণ আস্তে আস্তে দৌড়োচ্ছিলো মাদি নেকড়েটা, এবার সামান্য গতি বাড়িয়ে সে পৌঁছে গেলো ধূসর নেকড়েটার পাশে। অথচ এজন্যে ধূসর নেকড়েটা দাঁত খিঁচিয়ে তো উঠলোই না, বরং একটা

গদগদভাব দেখা গেলো তার মধ্যে। আজ সে নিজেই মাদিটার পাশে পাশে দৌড়োতে উদগ্রীব। আগ্রহের আতিশয্যে কখনো কখনো সে চলে আসছে মাদিটার একেবারে পাশে, ফলে কামড় দেয়ার বদলে আজ তাকেই কামড় খেতে হচ্ছে বারবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না তার মধ্যে। প্রত্যেকবার কামড় খেয়েই লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, আজ যেন সে পরিণত হয়েছে গ্রাম্য কোনো কুকুরে।

ওদিকে মাদি নেকড়েটার হয়েছে আরেক ঝামেলা। তার ডান পাশ দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে শুকনো এক বুড়ো নেকড়ে। তার সারা শরীর জুড়ে কাটাকাটি আর নষ্ট হয়ে যাওয়া বাঁ-চোখ বহন করছে বহু লড়াইয়ের স্মৃতি। মাঝে মাঝে বুড়ো নেকড়েটাও এতো কাছে চলে আসছে যে, তার নাক ছুঁয়ে যাচ্ছে মাদিটার কাঁধ। ধূসর নেকড়েটা বেশি কাছে আসার চেষ্টা করার সাথে সাথে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে মাদিটা। কিন্তু দুই প্রেমিক যখন একইসাথে এগিয়ে আসছে দু'পাশ থেকে, দু'টোর দিকেই তেড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না তার। কামড় খেয়ে প্রেমিকাকে কিছু না বললেও পরস্পর দাঁত খিঁচোচ্ছে দুই প্রেমিক। তারা হয়তো লড়াইয়েও নামতো, যদি না তাদের কাঁধে থাকতো দলের খিদে মেটানোর ভার।

প্রেমিকার কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বুড়োটা সরে যেতে প্রতিবার তার ধাক্কা লাগছে ডান পাশের তিন বছর বয়েসী একটা নেকড়ের সাথে। কারণ ডান চোখে সে কিছুই দেখতে পায় না। বেশ বাড়ন্ত গড়ন তরুণ নেকড়েটার, দলের কঙ্কালসার নেকড়েদের তুলনায় তেজও অনেক বেশি। একচোখো বুড়োটার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৌড়োচ্ছে সে, হঠাৎ দু'একবার আগে যাবার চেষ্টা করতে কামড়

খেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে আবার। মাঝেসাঝে ইচ্ছে করে সামান্য পেছনে পড়ে মাদি আর বুড়ো নেকড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়তে চাইছে সে, কিন্তু এতে কখনো দ্বিমুখী, এমনকি ত্রিমুখী আক্রমণের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। মাদি নেকড়ে একটু বিরক্তি প্রকাশ করার সাথে-সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বুড়োটা। থেকেথেকে মাদিটা নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সুযোগ পেলে ছেড়ে দিচ্ছে না ধূসর নেকড়েটাও।

কামড় খেয়ে লাফিয়ে পেছনদিকে সরে আসছে তরুণ নেকড়ে। শক্ত হয়ে যাচ্ছে সামনের দুই পা, লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্করভাবে বেরিয়ে পড়ছে তীক্ষ্ণ দু'সারি দাঁত। সামনের দিকে গোলমাল শুরু হলে তার রেশ দলের পেছনের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ নেকড়েটা বার-বার সরে আসায় ধাক্কা খেলো পেছনের নেকড়েদের সাথে, আর প্রতি-বারই তার পেছনের পায়ে আর পাঁজরে কামড় দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলো তারা। নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনতে লাগলো নেকড়ে-টা। কারণ খিদের পাশাপাশিই আসে রাগ। তারুণ্যের অদম্য বিশ্বাসে শুধু বারবার চেষ্টা করে চললো সে। বুঝতেও পারলো না, এ-চেষ্টা তার জন্যে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না।

পেটে খাবার থাকলে হয়তো ভালোবাসা কিংবা দলে নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে লড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু প্রচণ্ড খিদেয় এরা হয়ে উঠেছে মরিয়া। দলের পেছনে পেছনে আসছে অত্যন্ত বৃদ্ধ, খোঁড়া আর তরুণেরা। শক্তিশালীরা ছুটে চলেছে সামনে। তবে শক্তি-শালী হোক বা দুর্বল, কেউ যেন নেকড়ে নয়—নেকড়ের কঙ্কাল। অথচ এ-অবস্থাতেও শুধু খোঁড়াগুলো ছাড়া সবাই যেন অফুরন্ত শক্তির আধার। ইস্পাতদৃঢ় পেশিগুলো যেন জানে না, ক্লান্তি কি জিনিস।

সেদিন তারা দৌড়োলো মাইলের পর মাইল। রাতেও। তারপর

রাত কেটে গিয়ে একসময় এলো ভোর, দৌড় ওদের তখনো থামেনি। অচঞ্চল বরফের রাজ্যে তারাই একমাত্র চঞ্চল। প্রাণময়। আর বেঁচে থাকতে হলে প্রাণ আছে, এমন কোনো জিনিস খুঁজে বের করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তাদের।

নিচু-নিচু কয়েকটা জলবিভাজিকা আর গোটা বারো স্রোতস্বিনী পেরিয়ে যাবার পর তাদের খোঁজাখুঁজি সার্থক হলো। মদ্দা একটা মুজের দেখা পেলো তারা। জানোয়ারটা বিশাল, কিন্তু রহস্যময় কোনো আগুন সেটার চারপাশ ঘিরে রাখেনি। তবু অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় রইলো নেকড়ের পাল। কারণ ওপরদিকে ওলটানো ওই চ্যাপটা খুর আর হাতের তালুর মতো শিংগুলোকে তারা ভালো করেই চেনে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু হিংস্র একটা লড়াই শুরু হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। চারপাশ থেকে মুজটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বুভুক্ষু নেকড়েরা। প্রকাণ্ড খুরের প্রচণ্ড আঘাতে শরীর কালাফালা হয়ে গেলো তাদের, দু'ভাগ হয়ে গেলো খুলি, ভারী পায়ের নিচে চাপা পড়েও জীবন দিলো কেউ কেউ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলো মুজটা। মাদি নেকড়েটা ছিঁড়ে ফেললো তার টুঁটি। তারপর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার আগেই তাকে খেতে শুরু করলো নেকড়ের পাল।

আটশো পাউণ্ডেরও বেশি ওজন হবে মুজটার। অর্থাৎ গোটা চল্লিশেক নেকড়ের একেকটার ভাগে পড়লো বিশ পাউণ্ড করে মাংস। কিন্তু যেমন খিদে সহ্য করতে পারে তারা, খেতেও পারে তেমনি। দেখতে দেখতে কয়েকটা হাড় ছাড়া আর কিছুই রইলো না মুজটার।

এবার শুধু বিশ্রাম আর ঘুম। ভরপেটে সামান্য বিষয় নিয়েই লড়াই করতে লাগলো কমবয়েসী মদ্দাগুলো। কয়েকদিন পর শুরু হলো দল ভাঙার পালা। অবশ্য পুরো দলটাই যে ভেঙে গেলো, তা নয়। তবে

যেহেতু মরিয়া হবার আর প্রয়োজন নেই, সাবধানে, বেছে বেছে তা ধরতে লাগলো ভারী মাদি আর খোঁড়া বুড়ো মুজগুলোকে।

ধীরে ধীরে একদিন অর্ধেক হয়ে গেলো দলটা, বাকি অর্ধেক ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। ধূসরটাকে বাঁ-পাশে আর কানা বুড়োটাকে ডানপাশে নিয়ে অর্ধেক দলসহ ম্যাকেঞ্জি নদী পেরিয়ে পুবের হ্রদবহুল পার্বত্য অঞ্চলের দিকে চলে গেলো মাদি নেকড়েটা। প্রতিদিনই হ্রাস পেলো নেকড়ের সংখ্যা। সাধারণত একটা মদ্দা আর একটা মাদি। জোর ধরে কেটে পড়তে লাগলো। কদাচিৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে বিতাড়িত হলো নিঃসঙ্গ কোনো মদ্দা। অবশেষে চারটে মাত্র নেকড়ে রয়ে গেলো একসাথে—মাদি, ধূসর, একচোখো আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণটা।

ইতোমধ্যে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছে মাদি নেকড়েটা। তার কামড়ে কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে তিন পাণিপ্রার্থী। অথচ তারপরেও কখনোই রুখে ওঠেনি তারা, বরং লেজ নেড়ে রাগ কমাতে চেয়েছে প্রেমিকার। তবে প্রেমিকার প্রতি তারা যতোটা সহনশীল, পরস্পরের প্রতি ততোটাই হিংস্র। আর সবচেয়ে হিংস্র হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণটা। কানা বুড়োর একটা কান ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো সে। ডানপাশে কিছুই দেখতে পায় না বুড়োটা, শক্তিও অনেক কমে এসেছে, কিন্তু শরীরময় অজস্র কাটাকুটি বহন করছে বহু অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

সুন্দরভাবেই শুরু হলো লড়াইটা, কিন্তু শেষের দিকে গিয়ে আর সুন্দর রইলো না। ধূসর নেকড়েটা যোগ দিলো বুড়োর সাথে, তারপর দু'জন মিলে খতম করতে উদ্যত হলো তরুণটাকে। একসাথে শিকার, দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা, কিছুই আর মনে রইলো না। সবই যেন ঘটে গেছে সুদূর কোন্ অতীতে। বর্তমান এখন ভালোবাসার প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা, যা খাবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়েও অনেক বেশি কঠোর।

ওদিকে বসে বসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখছে মাদি নেকড়েটা। সে যেন উপভোগও করছে ব্যাপারটা। কারণ এরকম দিন তো জীবনে খুব বেশি আসে না।

তরুণটার মৃতদেহের একপাশে বসে কাঁধের একটা ক্ষত চাটার জন্যে ঘাড় ফেরালো ধূসর নেকড়েটা। বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে আরেক পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো বুড়ো, এক কামড়ে গলার মোটা নলটা কেটে দিয়ে লাফিয়ে চলে গেলো আগুনের বাইরে।

আকাশফাটানো চিৎকার ছাড়লো নেকড়েটা। কিন্তু মাঝপথেই আটকে গেলো তার গলা। থকথক করে কাশতে লাগলো সে, কাশির সাথে উঠে আসতে লাগলো তাজা রক্ত। লড়াই শুরু করলো সে। কিন্তু ক্রমেই অসাড় হয়ে এলো পা, খাটো হয়ে গেলো লাফ, চোখের সামনে ঘোলা হয়ে উঠলো পৃথিবী।

আর সমস্ত সময়টুকু ধরেই হাসিমুখে বসে রইলো মাদিটা। বুনো-জগতের ভালোবাসার ধরনই এরকম। এই ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে মারা যায়, শুধু তার কাছেই এটা বেদনাদায়ক। কিন্তু যে বেঁচে থাকে, তার কাছে লাভজনক এবং সেইসাথে উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ধূসর নেকড়ের সম্পূর্ণ নিশ্চল দেহের পাশ দিয়ে সতর্কভাবে সাথে মাদিটার দিকে এগিয়ে গেলো বুড়ো। পালিয়ে আসার জন্যে এক-রকম তৈরি হয়েই ছিলো সে, কিন্তু এই প্রথম তাকে তাড়া খেতে হলো না। কাছে এসে নাকে নাক ঘষলো মাদিটা। তারপর এমনভাবে লাফালাফি শুরু করলো, যেন নিরীহ কুকুরছানার মতো খেলতেও রাজি। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে, বোকার মতো মুখ করে বুড়োটাও লাফাতে লাগলো। কুকুরছানার মতো।

ইতোমধ্যেই বুড়ো নেকড়েটা ভুলে গেছে পরাজিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা, শুধু বরফ সে-ঘটনার স্মৃতিতে বুকে ধরে আছে লাল কিছু চিহ্ন। অবশ্য ক্ষত চাটতে গিয়ে ঘটনাটা মনে পড়লো বুড়োর। তৎক্ষণাৎ টান-টান হয়ে গেলো সমস্ত পেশি, নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেলো লোম, লাফ দেয়ার জন্যে নিচু হয়ে এলো মাথা। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সব ভুলে গিয়ে মাদি নেকড়েটার পিছু পিছু সে ছুটে চললো বনপথে।

এরপর থেকে সমঝোতায় আসা দুই বন্ধুর মতো তারা ছুটতে লাগলো পাশাপাশি। দিনের পর দিন শিকার করলো একসাথে, মাংস খেলো ভাগাভাগি করে। তারপর একসময় অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো মাদিটা। হাবভাবে মনে হলো, কী একটা জিনিস যেন খুঁজে চলেছে সে, অথচ পাচ্ছে না। পড়ে যাওয়া গাছের নিচের গর্ত আর পাহাড়ের গুহার ব্যাপারে বেড়ে চললো তার আগ্রহ। একচোখোটার এসব ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই, তবু সঙ্গ দেয় সে। শুধু খোঁজার সময় অত্যন্ত দীর্ঘ হলে সে বসে পড়ে বরফের ওপর, তারপর মাদিটা ফিরে এলে রওনা দেয় একসাথে।

ঘুরতে ঘুরতে আবার তারা চলে এলো ম্যাকেঞ্জি নদীর কাছে। চারদিক থেকে যেসব স্রোতস্বিনী এসে মিলিত হয়েছে নদীর সাথে, শিকারের জন্যে সেদিকে গেলেও নদীটার কাছেই তারা ফিরে এলো বারবার। মাঝেমাঝে তাদের দেখা হলো অন্যান্য নেকড়ে-দম্পতিদের সাথে, কিন্তু দল গঠনের ইচ্ছে তো দূরের কথা, বন্ধুত্বের কোনো চিহ্নও প্রকাশ পেলো না ওদের আচরণে। তবে নিঃসঙ্গ মদ্দা নেকড়েরা তাদের সাথে ভিড়ে যাবার আগ্রহ দেখালো প্রচুর, কিন্তু দু'জোড়া দাঁতের সারির সামনে সে-আগ্রহ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

এক চাঁদনি রাতে নিস্তব্ধ বনপথে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে গেলো

একচোখো। কান খাড়া করে, নাক ওপরদিকে তুলে বাতাস শুঁকতে লাগলো সে। অথচ চেষ্টা করেও যে ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছিলো না, হেলাভরে মাত্র একবার বাতাস শুঁকেই তা বুঝে ফেললো মাদিটা। আশ্বাস দেয়ার জন্যে পাশ কাটিয়ে আগে বাড়লো সে, তবু দূর হলো না একচোখোটার সন্দেহ।

গাছগাছালির মাঝখানের বড়ো একটা ফাঁকা জায়গার প্রান্তে গিয়ে উঁকি দিলো সে। একটু ইতস্তত করলো কানাটা, তারপর অত্যন্ত সাবধানের সাথে গিয়ে দাঁড়ালো মাদিটার পাশে।

কুকুরদের খেয়োখেয়ি, পুরুষকণ্ঠের চিৎকার আর মেয়েদের ঝগড়ার শব্দ ভেসে এলো কানে। বিরাট বিরাট চামড়ার তাঁবু, আগুন, ধোঁয়া আর মানুষ দেখতে পেলো তারা। আসলে একদল ইণ্ডিয়ান তাঁবু গেড়েছে এখানে। একচোখো এসবের মাথামুণ্ডু না বুঝলেও মাদিটার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না বুঝতে।

একচোখোটার ভেতরে সন্দেহ দেখা দিলেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে মাদিটা। যাবার জন্যে পা বাড়ালো একচোখো, কিন্তু আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মাদিটা ছুঁয়ে দিলো তার নাক। ওই আগুন, কুকুরের পাল আর মানুষগুলোর কাছে যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে সে।

একচোখো দেখলো, আবার অস্থির হয়ে উঠেছে মাদিটা। অধৈর্য হয়ে পায়চারি শুরু করলো সে, তারপর মাদিটা একসময় ফিরতি পথ ধরতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

জ্যোৎস্নালোকিত বনপথ ধরে ছায়ার মতো নিঃশব্দে ছুটতে ছুটতে একেবারে টাটকা একটা পদচিহ্ন খুঁজে পেলো তারা। মাদিটাকে পেছনে ফেলে আগে উঠতে একচোখোটা দেখলো, শাদা বরফের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে শাদা কী যেন একটা। যথেষ্ট জোরেই দৌড়োচ্ছি-

লো তারা, কিন্তু সে-দৌড় ওই জিনিসটার নাগাল পাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সুতরাং গতি আরো বাড়িয়ে তারা এবার ছুটতে লাগলো একটা সরু পথ ধরে। দু'পাশে কচি দেবদারুর সারি, সামনে লাফাতে লাফাতে চলেছে শাদা বস্তুটা। ধীরে ধীরে কমতে লাগলো দূরত্ব। নাগালের মধ্যে পৌঁছুতে শেষ লাফটা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো একচোখো, কিন্তু লাফটা তার আর দেয়া হলো না। হঠাৎ সাঁ করে ওপরদিকে উঠে গেলো খরগোশটা। ছোট্ট ছোট্ট পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অস্থির হয়ে উঠলো, কিন্তু নিচে আর নেমে এলো না।

আতঙ্কিত হয়ে কয়েক ধাপ পেছনে সরে গেলো একচোখো, দাঁত খিঁচোতে লাগলো অজানা জিনিসটার উদ্দেশে। কিন্তু নির্বিকারভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো মাদিটা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো, তারপর লাফিয়ে উঠলো ওপরদিকে। প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে খরগোশটাকে লক্ষ্য করে আবার লাফ দিলো সে। তারপর আবার।

ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেলো একচোখোটার। মাদি নেকড়েটার বারংবার ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে এগিয়ে এসে বিরাট এক লাফ দিলো সে, খরগোশটাকে দাঁতে চেপে নেমে এলো মাটিতে। ঠিক এইসময়ে মচ্‌মচ্‌ করে একটা শব্দ হলো পাশে। অবাক চোখে চেয়ে সে দেখলো, আঘাত হানার জন্যে তার দিকেই নেমে আসছে দেবদারুর একটা চারা। অদ্ভুত এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পেছনদিকে লাফ দিলো সে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, গরগর করে একটা শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে, যুগপৎ রাগ আর আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে প্রত্যেকটা লোম। বিস্ময়ের পর বিস্ময়, লাফ দেয়ার সাথে সাথে খরগোশসহ চারাটা আবার উঠে গেছে ওপরে।

রেগে গেলো মাদি নেকড়েটা। কামড় দিলো সাথীর কাঁধে। নতুন কোনো শত্রু আক্রমণ করেছে ভেবে রুখে দাঁড়ালো একচোখো, কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই তার দাঁত সজোরে বসে গেলো মাদিটার নাকে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়লো মাদিটা। ততোক্ষণে একচোখোও বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল। মাদিটাকে শান্ত করার জন্যে যথাসাধ্য করলো সে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিয়ে চক্কর দিতে লাগলো চারপাশ ঘিরে, সতর্কতার সাথে মাথাটা বাঁচিয়ে কাঁধ পেতে সইতে লাগলো প্রেমিকার দাঁতের মৃদু অত্যাচার।

ওদিকে পা ছুঁড়েই চলেছে খরগোশটা। রাগ প্রশমিত হবার পর মাদিটা সরে গিয়ে বসে পড়লো বরফের ওপর। প্রেমিকের ভয়ে রহস্যময় চারাটার ভয় উপেক্ষা করে আবার ওপরদিকে লাফ দিলো একচোখো, দাঁতে চেপে খরগোশটাকে নামিয়ে আনলো মাটিতে। যথারীতি নেমে এলো দেবদারুর চারাটা। তীব্র একটা আঘাত সহ্য করার জন্যে শক্ত হয়ে গেলো তার কাঁধ, কিন্তু আঘাতটা লাগলো না। খানিকটা নেমে আসার পর থেমে গেছে চারাটা। সে লক্ষ্য করলো তার নড়াচড়ার সাথেসাথে নড়ে উঠছে চারাটাও, চুপচাপ থাকলে থেমে থাকছে। চারাটার উদ্দেশে মৃদু একটা গর্জন ছাড়লো সে, তারপর অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করে বসে রইলো চুপচাপ। ধীরে ধীরে গরম সুস্বাদু রক্তে ভরে উঠলো মুখ।

এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করলো মাদিটা। দোদুল্যমান চারাটাকে পরোয়া না করে একচোখোর দাঁতের ফাঁক থেকে সে ছাড়িয়ে নিলো খরগোশটা, এক কামড়ে আলাদা করে ফেললো মাথা। তৎক্ষণাৎ আবার ওপরদিকে উঠে একেবারে খাড়া হয়ে গেলো

চারটা, আর কোনো ঝামেলার সৃষ্টি করলো না। এবার নিশ্চিন্তমনে খরগোশটাকে খেতে বসলো দু'জনে।

খেতে খেতে মনে হলো এমনি আরো অনেক সরু সরু পথ আছে বনে, যেখানে হয়তো গাছের চারার সাথে আরো খরগোশ দোল খাচ্ছে বাতাসে। ধরতে হবে তাদের প্রত্যেকটাকেই। খাওয়া শেষ হতে সেই-সব সরু পথের সন্ধানে রওনা হলো মাদিটা, অনুগত ভৃত্যের মতো পিছু নিলো একচোখো—আগামী দিনগুলোতে কাজে লাগতে পারে ভেবে খরগোশের ফাঁদের জটিল ব্যাপারটাকে সে ভালোভাবে বুঝে নিতে চায়।

পাঁচ

গুহা

দু'দিন ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করলো তারা। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হলো না একচোখোর, অথচ ওই তাঁবুগুলো যেন মাদিটাকে জাদু করেছে। কিন্তু এক সকালে ধ্বনিত হলো প্রচণ্ড একটা শব্দ, একচোখোর মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরের একটা গাছে বিদ্ধ হলো বুলেট। আর ইতস্তত না করে ঝেড়ে দৌড় দিলো দু'জনে,

মাইলের পর মাইল পথের সাথে পিছিয়ে গেলো ভয়।

তবে খুব বেশি দূরে তারা গেলো না—মোটে দু'দিনের পথ। মাদি নেকড়েটা বুঝতে পারলো যে-জিনিসটার খোঁজ সে এতোদিন ধরে করে চলেছে সেটাকে পেতে হবে খুব শিগগির। বেশ ভারী হয়ে গেছে শরীরটা। দৌড়োনো যাচ্ছে এখনো, কিন্তু খুবই ধীরে। একটা খরগোশ ধরতে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই হাল ছেড়ে দিলো সে, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়লো টানটান হয়ে। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় কতো অনায়াসেই না খরগোশটাকে ধরতে পারতো সে। সাথীকে এভাবে শুয়ে পড়তে দেখে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলো একচোখো, কিন্তু ঘাড়ের কাছে নাক ঘষতেই কঠিন এক থাবা তাকে ছিটকে দিলো দূরে। ধৈর্য বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই মাদিটার; ওদিকে পরিস্থিতির সাথে পাল্লা দিয়েই যেন বেড়ে চলেছে একচোখোর ধৈর্য।

অবশেষে সত্যিসত্যিই একদিন মাদিটা পেয়ে গেলো তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস। ছোট একটা স্রোতস্বিনীর ধার দিয়ে কয়েক মাইল উজানে যাবার পর সে খুঁজে পেলো ছোট্ট একটা গুহা। গরমের সময় স্রোতস্বিনীটা গিয়ে মিলিত হয় ম্যাকেঞ্জি নদীর সাথে, কিন্তু এখন এটার বুক ভরে আছে নিরেট বরফে।

গুহার মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দু'পাশ দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে দেয়াল পরীক্ষা করলো মাদিটা। তারপর সরু মুখটা দিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। প্রথমে হাত দুয়েক তাকে এগোতে হলো হামাগুড়ি দিয়ে তারপর ক্রমে ক্রমে চওড়া হয়ে এলো গুহাটা। ছ'ফুট ব্যাসের গোল একটা খোপে পৌঁছার পর থেমে গেলো মাদিটা, বেশ গরম এবং আরামদায়ক হওয়া সত্ত্বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো ছাদ। ইতোমধ্যে অনেকটা এগিয়ে যাবার পর ফিরে এসেছে একচোখো,

গুহামুখে দাঁড়িয়ে ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য করছে মাদিটার কার্যকলাপ। মাথা নামিয়ে নিজের পেটের দিকে চেয়ে রইলো মাদিটা। তারপর কয়েকটা চক্কর দিয়ে মৃদু গর্জনের মতো একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রবেশপথের দিকে মুখ করে বসে পড়লো। ধপাস করে। কৌতূহলভরে কান চোখা করে হেসে উঠলো কানা। কান চোখা করে হাঁ মেলে লম্বা জিভ বের করে মাদিটা বুঝিয়ে দিলো—পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়েছে সে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে একচোখোর। গুহামুখে শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ঘুমও হলো না ভালোমতো। তন্দ্রার মাঝে দূরাগত জলের কুলকুল শব্দ তার কানে বয়ে আনলো বসন্তের বার্তা।

বারবার গুহার ভেতরে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকালো সে, কিন্তু ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না মাদিটার মধ্যে। বাইরে প্রকৃতির দিকে তাকাতে গোটাছয়েক স্নোবার্ড তার চোখে পড়লো। একবার উঠে মাদিটার দিকে চেয়ে আবার শুয়ে পড়লো সে। চুলতে লাগলো তন্দ্রায়। কিছুক্ষণ পর তীক্ষ্ণ একটা গুঞ্জন ভেসে এলো কানে। ঘুমের ঘোরেই থাবা দিয়ে বার দুয়েক নাক ঘসলো সে। তারপর জেগে গেলো। নাকের ঠিক ডগায় গুন্‌গুন্‌ করে উড়ছে একটা মশা। সারাটা শীত কাঠের গুঁড়ির ওপর বরফের মতো জমে থাকে এরা। কিন্তু এখন বরফ গলার সাথেসাথে এদেরও ঘুম ভেঙেছে। প্রকৃতির হাতছানি উপেক্ষা করা আর সম্ভব হলো না একচোখোটার পক্ষে। সর্বোপরি, খিদে পেয়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকে মাদিটাকে জাগাবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু মাদিটা তো জাগলোই না বরং দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। ফলে আবার বেরিয়ে এসে একাএকাই সে হাঁটতে লাগলো উজ্জ্বল সূর্যালোকে। কিন্তু পায়ের নিচের বরফ অনেক নরম হয়ে এসেছে, হাঁটা

যাচ্ছে না ভালোভাবে। একটু চিন্তা করে সে এবার হাঁটতে লাগলো স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে। গাছের ছায়া থাকায় বরফ এখানে অনেকটা শক্ত। প্রায় আট ঘণ্টা হেঁটে সে যখন ফিরলো চারদিক তখন ঢেকে গেছে আঁধারে। ইতোমধ্যে নানারকম শিকার চোখে পড়েছে তার কিন্তু ধরতে পারেনি একটাকেও। ফলে আরো বেড়ে গেছে খিদে।

গুহামুখে এসে দাঁড়াতে কী যেন একটা সন্দেহ হলো তার। অস্পষ্ট অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। মাদি নেকড়ের না হলেও ওই শব্দ যেন তার পরিচিত। অত্যন্ত সতর্কভাবে গুহায় ঢুকে পড়লো সে, কিন্তু একটা গর্জন তাকে সাবধান করে দিলো। এই প্রথম কোনোরকম বিরক্ত না করা সত্ত্বেও গর্জে উঠলো মাদিটা। তাই কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে এগিয়ে না গিয়ে দূরেই বসে থাকলো সে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না একচোখো, তবু অস্পষ্ট ফোঁপানির মতো ওই বিচিত্র শব্দ টানতে লাগলো তাকে।

আবার গর্জে উঠলো মাদিটা। ফলে আরো কিছুটা পিছিয়ে গুহা-মুখেই শুয়ে পড়লো সে। সকালে আলো ফুটতে ঘুম থেকে উঠে ধীরে ধীরে খানিকটা এগিয়ে গেলো একচোখো। আবার গর্জে উঠলো মাদিটা, কিন্তু রাগের বদলে এবার তাতে ফুটে উঠলো ঈর্ষা। অবাক একটা চোখে সে দেখলো, মাদিটার কোলের কাছে শুয়ে আছে জীব-নের পাঁচটা পুঁটুলি। চোখ এখনো মেলতে পারে না, শুধু গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে। একচোখোর দীর্ঘ সার্থক জীবনে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবু প্রতিবারই এ-ঘটনা তার জন্যে বয়ে এনেছে পরম বিস্ময়।

উদ্বিগ্নচোখে সাথীর দিকে চেয়ে রইলো মাদিটা। সে চাইছিলো না আরো কাছে আসুক একচোখো। কারণ তার জন্যে এটা নতুন ঘটনা

হলেও আর দশটা নেকড়ে-মায়ের মতো তার স্মৃতিতেও আতঙ্ক হয়ে আছে বাবা-নেকড়েদের কথা—নিষ্ঠুর যে-বাবারা চুপিচুপি এসে খেয়ে ফেলে অসহায় বাচ্চাদের।

তবে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ ছিলো না। সহজাত প্রবৃত্তি-বশে একচোখোও বুঝতে পেরেছিলো, এখানে তার আর থাকা চলবে না। নতুন পরিবারের জন্যে তাকে এখন নিতে হবে মাংস সংগ্রহের ভার।

গুহা ছেড়ে পাঁচ ছ'মাইল যাবার পর দু'ভাগ হয়ে গেলো স্রোত-স্বিনীটা। বাঁ-শাখা ধরে খানিকটা এগোতেই একেবারে টাটকা একটা চিহ্ন পেয়ে গেলো সে। কিছুদূর যাবার পর দেখলো, চিহ্নটা চলে গেছে ডান শাখার দিকে।

ডান শাখা ধরে আধ মাইল এগোতে তার কানে ধরা পড়লো চিবোনোর মতো একটা শব্দ। আরো একটু এগোতে সে দেখলো, গাছের ছাল চিবোচ্ছে একটা শজারু। হতাশ হয়ে পড়লো সে। জীবনে কখনো এই জানোয়ারটাকে সে খাদ্য হিসেবে পায়নি। একবার ভাবলো, চলে যাওয়াই ভালো। পরক্ষণেই মনে পড়লো, সুযোগ বলেও একটা কথা আছে। দেখাই যাক না, কী হয়!

একচোখোর উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র গোল একটা বলের মতো করে নিজেকে গুটিয়ে নিলো শজারুটা। হাতখানেকের মধ্যে পৌঁছার পর আর এগোলো না একচোখো, চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ওই কাঁটা-গুলোকে সে ভালো করেই চেনে। যৌবনে একবার একটা কাঁটা ফুটেছিলো তার নাকে, ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রণা আজো অম্লান হয়ে আছে স্মৃতিতে। চুপ করে রইলো একচোখো। কখন কী ঘটে বলা যায় না। হয়তো একটু পরেই দেহ মেলে দেবে শজারুটা, অরক্ষিত পেটে থাবা

মারার একটা সুবর্ণসুযোগ পাওয়া যাবে।

কিন্তু আধঘণ্টা পরেও যখন তারই মতো নিশ্চল হয়ে রইলো শজারুটা, একটা গর্জন ছেড়ে উঠে পড়লো একচোখো। এতোক্ষণ অপেক্ষা করা মোটেই ঠিক হয়নি। অতীতেও এই বিজ্ঞাত জানোয়ার-গুলো বারবার ঠকিয়েছে তাকে। গজগজ করতে করতে ডান শাখা ধরে ফিরে চললো একচোখো।

শিকারে ব্যর্থ হবার যন্ত্রণা আরো সচেতন করে তুললো তার পিতৃত্ব-কে। একটা—অন্তত একটা শিকার পেতেই হবে তাকে। কথাটা ভাবতে ভাবতে একটা ঝোপ থেকে বেরোতেই একেবারে সামনে সে দেখতে পেলো একটা টারমিজান চুপ করে বসে আছে কাঠের গুঁড়ির ওপর। হতভম্ব হয়ে একচোখোর দিকে তাকিয়ে রইলো বোকা পাখিটা। তারপর ব্যস্ত হয়ে ওড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এক থাবায় পাখিটাকে নামিয়ে আনলো একচোখো, নিষ্ঠুর দাঁতের চাপে মড়মড় করে ভেঙে গেলো নরম হাড়। নিজের অজান্তেই পাখিটাকে খেতে উদ্যত হয়েছিলো সে, হঠাৎ তার মনে পড়লো পরিবারের কথা।

পাখিটাকে মুখে করে স্রোতস্বিনীর মাইলখানেক উজানে যাবার পর তার চোখে পড়লো একটা পদচিহ্ন। আজ সকালে এই চিহ্নটা এক-বার দেখেছে সে। আরো সন্তর্পণে, প্রায় ছায়ার মতো এগিয়ে চললো একচোখো। এখন যে-কোনো বাঁকে যে-কোনো জায়গায় দেখা হয়ে যেতে পারে জানোয়ারটার সাথে।

বেশ বড়ো একটা বাঁকের কাছে গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিতেই সে দেখতে পেলো জানোয়ারটাকে—বিরাট মাদি লিংক্স। আজ সে যেভাবে বসেছিলো, ঠিক সেইভাবেই লিংক্সটা বসে আছে একটা হোয়াইট ফ্যাং

শজারুর সামনে।

টারমিগানটাকে পাশে রেখে বরফের ওপর বসে পড়ে চুপিচুপি সে দেখতে লাগলো জীবনের খেলা। এ-খেলায় হয় লিংক্সটার জীবন-ধারণের জন্যে শজারুটাকে মরতে হবে, নয়তো শজারুটার জীবন ধারণের জন্যে বলিত হতে হবে লিংক্সটাকে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও সে নিজেও এই খেলার একজন খেলোয়াড়। ওদের দু'জনের কোনো ভুল তার জীবন ধারণের জন্যে জুটিয়ে দিতে পারে মাংস।

আধ ঘণ্টা কেটে গেলো, এক ঘণ্টা; কিছুই ঘটলো না। পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলো শজারুটা, লিংক্সটাও যেন পরিণত হয়েছে মর্মরের কোনো মূর্তিতে, আর সে নিজে হয়ে আছে মৃতের মতো নিশ্চল —তিনজনেই এই যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে শুধু জীবনধারণের তাগিদে।

হঠাৎ একটু নড়েচড়ে বসে একচোখো। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। শত্রু চলে গেছে মনে করে ধীরে, খুব ধীরে দেহ মেলতে লাগলো শজারুটা। আর চোখের সামনে খাদ্যের এই আত্মপ্রকাশ দেখে অজান্তেই মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়লো একচোখোর।

দেহ পুরোপুরি না মেলতেই শত্রুকে দেখে ফেললো শজারুটা। বিদ্যুদ্‌বেগে আঘাত হানলো লিংক্স। বাঁকানো তীক্ষ্ণ নখগুলো চিরে দিলো শজারুর পেটের একটা পাশ। এক মুহূর্ত আগে আঘাত হানলে হয়তো কিছুই হতো না লিংক্সটার, কিন্তু সামান্য এই দেরির ফলে থাবা টেনে নেয়ার আগেই লেজ চালালো শজারুটা।

বিস্ময়ে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো লিংক্সটা। সে যেন ভাবতেও পারছে না, এতো ছোট একটা প্রাণী এমন কঠিন আঘাত হানতে পারে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো একচোখো। দুর্বলভাবে দেহটা গুটিয়ে

নেয়ার চেষ্টা করছিলো শজারু, ঠিক সেইসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বদমেজাজী লিংক্স। চোখের পলকে আবার লেজ চালালো শজারুটা। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে পিছিয়ে এলো লিংক্স, পুরো নাক ভরে গেছে অজস্র কাঁটায়। থাবা দিয়ে কাঁটাগুলো খোলার চেষ্টা করলো সে। তারপর বরফে গাছের ডালে নাক ঘষতে ঘষতে লাফাতে লাগলো পাগলের মতো।

কিছুক্ষণ পর পুরো এক মিনিট চুপ করে রইলো লিংক্সটা। তারপর কোনোরকম আভাস না দিয়ে বিরাট এক লাফের সাথে কানফাটানো চিৎকার ছেড়ে ফিরতি পথ ধরলো।

লিংক্সটা চোখের একেবারে আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলো একচোখো, তারপর এগিয়ে গেলো অত্যন্ত সাবধানে। তাকে দেখেই গুটিয়ে গোল হয়ে গেল শজারুটা। কিন্তু পেট চিরে হাঁ হয়ে যাওয়ায় কাজটা নিখুঁত হলো না।

প্রচুর রক্তপাতে লাল হয়ে গেছে বরফ। চেটে চেটে সেই রক্ত খেলো একচোখো, সাথেসাথে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো পেট। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেটেও শজারুটার কাছে যাবার মতো ভুল সে করলো না। নিরাপদ দূরত্বে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো একচোখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চিৎকার করতে লাগলো শজারুটা। দেখতে দেখতে মিইয়ে এলো সে-চিৎকার। ঝপ্ করে নেমে এলো কাঁটাগুলো, সারা শরীর একবার কাঁপিয়ে স্থির হয়ে গেল জানোয়ারটা।

অত্যন্ত সাবধানে কাছে গিয়ে শজারুটাকে উল্টে দিলো একচোখো। কিছুই ঘটলো না। এবার খুশিমনে শজারুটাকে বয়ে নিয়ে চললো সে। যেতে যেতে হঠাৎ করে মনে পড়লো একটা কথা। শজারুটা রেখে টারমিজানের কাছে চলে এলো সে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে পাখি-

টাকে চেটেপুটে খেয়ে আবার ফিরে গেল শঙ্কারুর কাছে।

শিকার নিয়ে গুহায় ঢুকতে তার ঘাড় চেটে দিলো মাদিটা, পরক্ষণেই বাচ্চাদের কথা ভেবে গর্জে উঠলো সে। কিন্তু সে-গর্জন আগের মতো ভয়াবহ নয়। একচোখোর ব্যাপারে আতঙ্ক অনেকটা কেটে গেছে তার। কারণ এই নেকড়েটা অন্যান্য বাঘ-নেকড়েদের মতো দায়িত্বহীন নয়। তাছাড়া যে-বাচ্চাগুলোকে সে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে তাদের খেয়ে ফেলার মতো অশুভ ইচ্ছেও এর আছে বলে মনে হয় না।

ছয়

ধূসর রঙের বাচ্চা

ভাইবোনদের থেকে সে একেবারেই আলাদা। ভাইবোনেরা সবাই পেয়েছে মায়ের লালাভ রঙ। শুধু সে-ই হয়েছে ধূসর, অবিকল বাপের মতো। অবশ্য বাপের সাথে একটা পার্থক্য তার রয়েছে। বাপের একটা চোখ কানা হলেও তার দু'টো চোখই ভালো।

অল্পদিন হলো চোখ ফুটেছে তার। অথচ সদ্যফোটা সেই চোখ দিয়ে সে যেটুকু দেখে, পরিষ্কারই দেখে। ইতোমধ্যে ভাইবোনদেরও চিনে নিয়েছে সে, সুযোগ পেলেই খেলাধুলা করে তাদের সাথে। আর

চোখ ফোটার অনেক আগেই সে চিনে নিয়েছে মা-কে। মা মানেই উষ্ণতা, তরল খাদ্য আর স্নেহের ভাণ্ডার। মা যখন জিভ দিয়ে তার ছোট্ট নরম শরীরটা চেটে দেয়, আরামের আতিশয্যে ঘুমের কোলে তলিয়ে যায় সে।

জীবনের প্রথম মাসটা সে একরকম ঘুমিয়েই কাটালো। তারপর ধীরে ধীরে কমে এলো ঘুমের সময়, নিজের পৃথিবীটাকে চিনে নিতে লাগলো সে। গুহার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ তার পৃথিবীটুকু সব-সময়ই ছায়াচ্ছন্ন, কিন্তু সেজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই তার মনে।

তবে দেয়ালগুলোর মধ্যে একটা যে একেবারেই অন্যরকম, এটা সে অনেক আগেই বুঝেছে। আর সেই দেয়ালটা হলো গুহামুখ—রহস্য-ময় আলোকধারার উৎস। চোখ ফোটার অনেক আগে থেকে আলো-কিত সেই দেয়াল ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সচেতন জীবন শুরু হবার আগে সুযোগ পেলেই ভাইবোনদের সাথে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে যেতো আলোর সেই উৎসের দিকে, আর প্রতিবারই মা তাদের ফিরিয়ে আনতো গুহার মধ্যে। সেসময় একবারও তারা গুহার অন্ধকার দেয়ালগুলোর দিকে যায়নি। তারপর বয়স বাড়ার সাথেসাথে নিজেদের যখন আলাদাভাবে চিনতে শিখলো তারা, আলোকিত দেয়ালটার প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে গেলো।

আলোকিত দেয়ালের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কারণেই মায়ের একটা নতুন রূপ দেখতে পেলো সে। মা শুধু স্নেহই করে না, প্রয়ো-জনবোধে শাসনও করে। অপছন্দের কোনো কাজ করলে নাক দিয়ে ঢুঁ মারে মা, থাবড়া মেরে ফেলে দেয় মাটির ওপর। এভাবেই তার ভেতরে জন্ম নিলো ব্যথার বোধ। আর এই বোধের সাথেসাথে ব্যথা এড়িয়ে যাবার কৌশলগুলোও শিখে নিলো সে। ব্যথা পাবার মতো

কোনো কাজ না করলে ভয়ের কিছু নেই ; কিন্তু ভুলক্রমে সেরকম কোনো অঘটন ঘটে গেলে মায়ের সামনে না পড়ে লুকিয়ে থাকাই ভালো।

বাচ্চাটা হিংস্র। তার ভাইবোনেরাও তাই। মাংসাশী বাবা-মা'র সন্তান হিংস্র হওয়াই স্বাভাবিক। জন্মের পর ওরা, দুধ খেয়েছে সত্যি, কিন্তু একমাস বয়স হতেই লোভ জন্মেছে মাংসের ওপর। মা-ও বুঝতে পেরেছে সেটা। তাই মাংস কিছুক্ষণ চিবোনোর পর সে উগরে দেয় বাচ্চাদের জন্যে।

বাচ্চাদের মধ্যে ধূসরটাই সবচেয়ে হিংস্র। তার রাগও সবার চেয়ে বেশি। ইতোমধ্যেই গর্জন করতে শিখেছে সে। শিখেছে, কীভাবে হঠাৎ থাবা মেরে ভাইবোনদের ধরাশায়ী করতে হয়।

সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে আলোকিত দেয়ালের আকর্ষণটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। অসংখ্যবার সে এগিয়ে যায় ওই দেয়ালের দিকে, অসংখ্যবার তাকে পেছনে টেনে আনে মা। বাইরের পৃথিবীতে যেমন আলো দেয় সূর্য, তার পৃথিবীর সূর্য যেন ওই দেয়ালটাই। অবশ্য বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে সে এখনো কিছুই জানে না।

আলোর ওই দেয়ালটা সম্পর্কে একটা ব্যাপার ভীষণ অবাক লাগে তার। বাবা ওই দেয়ালটার কাছে যাবার সাথেসাথে কেমন করে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। ইতোমধ্যে বাবাকে ভালোভাবে চিনে ফেলেছে সে। দেখতে অনেকটা মায়ের মতোই, আলোর কাছে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় আর কোত্থেকে যেন মাংস নিয়ে আসে তাদের জন্যে। কিন্তু বাবার এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছে, দুধ আর আধচিবোনো মাংস যেমন মায়ের বৈশিষ্ট্য, বাপের বৈশিষ্ট্য তেমনি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

অবশ্য মানুষের মতো চিন্তাশক্তি তার নেই। কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়াই তার কাছে বড়ো কথা। কেন ঘটলো, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। বাবা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে বলেই অদৃশ্য হয়ে যায়, আর সে অদৃশ্য হয় না, কারণ, সে পারে না। কিন্তু একই ব্যাপার বাবা কেন পারে, আর সে কেন পারে না—এটা তার ভাববার বিষয় নয়। আসলে, যুক্তি জিনিসটাই নেই তার মানসিক গঠনের মধ্যে।

অধিকাংশ বন্যপ্রাণীদের মতো শৈশবেই সে বুঝে গেলো, দুর্ভিক্ষ কী জিনিস। একটা সময় এলো, যখন হঠাৎ করেই কমে লাগলো মাংসের বরাদ্দ। ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেলো মায়ের দুধ। প্রথম কয়েক দিন তারা শুধু কাঁদলো, তবে বেশির ভাগ সময়ই কাটালো ঘুমিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অসাড় হয়ে এলো সারা শরীর, কোনোমতে জ্বলে রইলো জীবনের শিখা।

মরিয়া হয়ে উঠলো একচোখো। মাদি নেকড়েটাও বাচ্চাকাচ্চা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে লাগলো মাংসের সন্ধানে। কয়েকবার ইণ্ডিয়ানদের ফাঁদে পড়া খরগোশ চুরি করে আনলো একচোখো। কিন্তু বরফ গলে স্রোতস্বিনীগুলো ভরে ওঠায় তাঁবু গুটিয়ে ইণ্ডিয়ানেরা চলে গেলো অন্যদিকে। ফলে খাবারের এই রাস্তাটাও গেলো বন্ধ হয়ে।

দুর্ভিক্ষ কেটে যাবার পর একটা বোন ছাড়া ভাইবোনদের আর কাউকে নজরে পড়লো না ওর। শরীরটা একটু তাজা হতে একা-একাই খেলতে হলো তাকে। কারণ বোনটা আজকাল শুয়েই থাকে সবসময়, মাথাও তুলতে পারে না। ক্রমে ক্রমে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে পড়লো বোনটা, তারপর মরেই গেল একদিন।

আরেকটা দুর্ভিক্ষের পর বাবাকেও আর দেখতে পেলো না সে। মাদি নেকড়েটা জানে, একচোখো আর কোনোদিনই ফিরবে না, কিন্তু

মা হয়ে সে সন্তানকে কখনোই বলতে পারবে না এ-কথা। মাংসের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে গিয়েছিল স্রোতস্বিনীটার বাঁ শাখার উজানে। ওখানে বরফের ওপর ফুটে আছে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের চিহ্ন, আর সে-লড়াইয়ের শেষে খুশিমনে আপন গুহায় ফিরে গেছে একটা লিংক্স। গুহাটা অবশ্য খুঁজে পেয়েছিলো সে, কিন্তু লিংক্সটা সেসময় ভেতরে থাকায় ঢোকার সাহস পায়নি।

এরপর মাদি নেকড়েটা আর কখনোই যায়নি ওদিকে। কারণ বাচ্চা হয়েছে লিংক্সটার। গোটাছয়েক নেকড়ে একসাথে থাকলে শান্তিতে লিংক্স শিকার করা যায়, কিন্তু একটা নেকড়ের পক্ষে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে একেবারেই অন্যরকম। বিশেষ করে বাচ্চা হবার পরে এই ভয়ঙ্কর বদমেজাজী জানোয়ারটার মুখোমুখি হবার কথা ভাবাও যায় না।

কিন্তু সভ্য হোক আর বন্য হোক, মা মা-ই। সন্তানকে রক্ষার তাগিদে সে যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। যে লিংক্সের ভয়ে মাদি নেকড়েটা আজ ভীত, বাচ্চা অনাহারে থাকলে সেই লিংক্সেরই মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না সে।

সাত

পৃথিবীর দেয়াল

মা যখন শিকার করতে বেরোয়, চুপ করে গুহার মধ্যে বসে থাকে বাচ্চাটা। কারণ গুহার বাইরে যাওয়া তার একেবারেই নিষেধ। শুধু মায়ের চড়চাপড় আর নাকের গুঁতো খেয়েখেয়েই যে এই নিষেধাজ্ঞা সে মেনে চলতে শিখেছে, তা নয়। বড়ো হবার সাথেসাথে তার ভেতরে জন্ম নিচ্ছে ভয়ের একটা বোধ। জন্ম হবার পর থেকে এ-যাবৎ ভয় পাবার মতো কারণ অবশ্য তার কখনোই ঘটেনি। তবু ভয় পাচ্ছে সে। বাবা-মা, এমনকি হাজার হাজার বছরের পূর্বপুরুষদের রক্তের ধারা বেয়েই তার কাছে এসেছে ভয়ের এই উত্তরাধিকার।

অবশ্য ভয় জিনিসটা যে কোন্ উপাদানে গঠিত, তা সে জানে না। সম্ভবত তার মতে এটা জীবনের একধরনের সীমাবদ্ধতা। আরো সীমাবদ্ধতা আছে জীবনে। দুর্ভিক্ষের সময় খাবারের সীমাবদ্ধতাটাকে তো সে হাড়েহাড়ে চিনেছে। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, অথচ খাবার পাওয়া যায় না। এসব সীমাবদ্ধতা অনেকটা আইনের মতো। যন্ত্রণা এড়িয়ে সুখী জীবনযাপন করার খাতিরে আইনগুলো মেনে চলা

ভালো।

মানুষের মতো এতো পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা অবশ্য তার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে সে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছে। এক ধরনের জিনিস আছে, যেগুলো ব্যথা দেয়, অন্যগুলো দেয় না।

ভয়ের এই আইন মেনে চলার জন্যেই সে গুহামুখের কাছে যায় না। মা না থাকলে বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায় সে। ঘুম ভেঙে গেলে উঠে বসে থাকে চুপচাপ, অতি কষ্টে দমন করে রাখে উথলে ওঠা কান্না।

একদিন আলোর দেয়ালটার ওপাশ থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত এক গর্জন। সে বুঝতে পারলো না, তারই গায়ের গন্ধ পেয়ে ডেকে উঠেছে একটা উলভারাইন। কিন্তু বুঝতে না পারার জন্যেই আরো সচকিত হয়ে গেল সে। অজানা সবকিছুই ভয়ঙ্কর।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে মরার মতো পড়ে রইলো বাচ্চাটা। দাঁড়িয়ে গেছে শরীরের সবক'টা লোম। ঠিক এইসময়েই কানে এলো অতি পরিচিত একটা গর্জন। উলভারাইনের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছে মা। গুহায় ঢুকে পরম স্নেহে সে চেটে দিতে লাগলো সন্তানের শরীর। বাচ্চাটার মনে হলো, আজ অল্পের জন্যে বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে ও।

অন্যরকমের কিছু অনুভূতিও কাজ করে চলেছিলো বাচ্চাটার মনে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল হলো--শক্তি। সহজাত প্রবৃত্তি আর সীমাবদ্ধতার আইন তাকে শিখিয়েছে আনুগত্য। কিন্তু এই শক্তি, ক্রমবর্ধমান শরীর তাকে করে তুললো অবাধ্য। তবু এতোদিনের অভ্যেসবশত খানিকটা দ্বিধার দোলায় দুললো সে। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সত্যিসত্যিই একদিন এগোতে লাগলো আলোকিত দেয়ালটার দিকে।

অন্য দেয়ালগুলোর থেকে এটা একেবারেই আলাদা। হাতার এগোলেও ধাক্কা লাগে না, বরং দেয়ালটাই যেন পিছিয়ে যায়। ধীরে ধীরে আরো এগিয়ে গেলো সে। আরো।

তারপরেই হতভম্ব হবার পালা। উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেলো চোখ, বিশাল বিস্তার ঘুরিয়ে তুললো মাথা। কিন্তু আপনাআপনিই তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলো এই উজ্জ্বলতার সাথে। আলো কিছুটা সয়ে আসতেই সাঁ করে দেয়ালটা চলে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে। চোখ বন্ধ করলো বাচ্চাটা। চোখ মেলতে আবার সে দেখতে পেলো দেয়ালটা। তবে কেমন করে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে ওটার চেহারা। আলোর বদলে দেয়ালটার গা জুড়ে এখন গাছ, নদী, পাহাড় আর আকাশ।

ভয় পেলো সে। ভীষণ ভয়। চোখের সামনে যা-কিছু দেখছে সবই তার অপরিচিত। সুতরাং লোম খাড়া হয়ে গেলো ছোট্ট শরীরটার, কিন্তু বাঁকানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো হিংস্র এক গর্জন। নিজে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও সে যেন ভয় দেখাতে চাইলো সারা পৃথিবী-টাকে।

কিছুই হলো না। তার গর্জনের জবাবে ভেসে এলো না পাল্টা কোনো গর্জন। সুতরাং নিশ্চিন্তে সে এবার চোখ মেলে দিলো সামনের দিকে। গাছ নদী ঢালু জমি দেখতে দেখতে ভুলে গেলো গর্জন করার কথা। ভয়ের পরিবর্তে তাকে দখল করে নিলো কৌতূহল।

এতোদিন তার জীবন কেটেছে সমতল জায়গায়। ঢালে পড়ে যাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা এখনো হয়নি। সাহস করে আরো দু'পা এগোতে সেই অভিজ্ঞতা হলো বাচ্চাটার। ঢাল দিয়ে গড়িয়ে সে নেমে যেতে লাগলো নিচের দিকে। মায়ের চেয়েও জোরে নাকে গুঁতো

মারলো কঠিন মাটি। ককিয়ে কেঁদে উঠলো সে কুকুরছানার মতো।

এতোক্ষণ গুহার বাইরে ওত পেতেছিলো অজানা জানোয়ারটা, সুযোগ পেতেই জড়িয়ে ধরেছে। সহজে এটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। চুপ করে থেকেও নিস্তার নেই। আবার ককিয়ে উঠলো সে।

একসময় ধীরে ধীরে সে গিয়ে থামলো ঘাসে ছাওয়া একটা সমতল জমিতে। শেষ একটা দীর্ঘ চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে।

একটু পর পিটপিট করে চারদিকে তাকাতে সম্পূর্ণ অজানা এক জগতের মাঝে সে আবিষ্কার করলো নিজেকে। অজানা জানোয়ারটাও ভাগ্যিস ছেড়ে দিয়েছে। শরীর ঝাঁকুনি দিলো সে। না, আঘাত লাগেনি কোথাও।

এতোদিনে তার খুদে পৃথিবীর দেয়াল পেরিয়ে এলো বাচ্চাটা। আর জানোয়ারটা ছেড়ে দেয়ার ফলে ভয়ও কেটে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবাক বিস্ময়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে দেখলো ঘাস, মসকেরি আর ঝড়ে ভেঙে পড়া একটা পাইনের গুঁড়ি। ছুটোছুটি করতে করতে বাচ্চাটার একেবারে সামনে এসে পড়লো একটা কাঠবিড়াল। ভীষণ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গর্জে উঠলো বাচ্চাটা। আত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো কাঠবিড়ালের। এক দৌড়ে সে চলে গেলো নিরাপদ দূরত্বে, তারপর কিচিরমিচির করতে লাগলো হিংস্রভঙ্গিতে।

কাঠবিড়ালটাকে পালাতে দেখে তার সাহস একটু বেড়ে গেলো। এরপর একটা কাঠঠোকরাকে দেখে চমকে উঠলেও তেমন ভয় পেলো না সে। তারপর দেখা হলো একটা মুজ-বার্ডের সাথে। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কাছে আসতেই সে থাবা মারলো পাখিটাকে। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ একটা ঠোকর পড়লো নাকের ডগায়। ব্যথায় ককিয়ে

উঠলো সে। ভয় পেয়ে উড়ে পালালো মুজ-বার্ড।

প্রকৃতির পাঠ নিচ্ছে বাচ্চাটা। এ-যাবৎ পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে সে দু'ভাগে ভাগ করেছিলো। কিন্তু এখন তার মন বলছে, ভাগটা ওভাবে করা ঠিক হয়নি। ব্যথা দেয়া কিংবা না দেয়ার মধ্যে কোনো জিনিসের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। বরং জিনিসগুলোকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, একদল জীবিত এবং আরেক দল মৃত। যারা মৃত তারা নড়াচড়া করতে পারে না, কিন্তু জীবিতরা পারে। আর পারে বলেই এদের চালচলন বুঝে ওঠা খুব কঠিন। সুতরাং সচেতন থাকতে হবে জীবিতদের ব্যাপারে।

এখনো ঠিকমতো হাঁটতে পারে না সে। তবে যতোই হাঁটলো, ধীরে ধীরে ভালো হলো হাঁটা। কোনো কোনো ডাল মনে হলো অনেক দূরের, কিন্তু কয়েক ধাপ এগোতে না এগোতেই সেটা আঘাত হানলো নাকে বা পাঁজরে। কখনো কখনো পায়ের নিচে পড়ে উল্টে গেলো পাথর, সরসর করে সরে গেলো মুড়ি। সে বুঝলো, মৃতের মধ্যে বড়োর চেয়ে ছোট জিনিসগুলোই সহজে উল্টে যায়। আরো হাঁটলো সে, ঘটলো আরো দুর্ঘটনা। প্রত্যেকটা দুর্ঘটনাই তাকে দিলো নতুন নতুন শিক্ষা। পেশির সঞ্চালন এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতার ব্যাপারগুলো বুঝে নিলো সে। ধারণা জন্মালো এক জিনিস থেকে আরেক জিনিস, কিংবা সেই জিনিস থেকে নিজের দূরত্ব সম্বন্ধে।

বাইরের পৃথিবীতে আজই তার প্রথম দিন। সেই হিসেবে শুরুটা বেশ ভালোই হলো। সে মাংসাশীর বংশধর। এবং এ-ব্যাপারে সচেতন হবার আগেই সে পেয়ে গেলো শিকার। চলতে চলতে পাইনের পচা ছালে পা পিছলে গিয়ে সে ধাক্কা খেলো ছোট একটা ঝোপের সাথে। ঝোপের ঠিক মাঝখানে টারনিজানের বাসা, তাতে তুলতুলে সাতটা

বাচ্চা।

বাচ্চাগুলো চিঁ চিঁ করে উঠতে প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলো সে। কিন্তু ওগুলোর ক্ষুদ্র শরীর তাকে সাহস জোগালো। একটা বাচ্চার ওপর থাবা রাখলো সে। মুহূর্তের মধ্যে বেড়ে গেলো বাচ্চাটার ছট-ফটানি। এবারে বাচ্চাটার গন্ধ শুঁকলো সে, তারপর চেপে ধরলো দাঁতের ফাঁকে। ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো বাচ্চাটা, আর এই ছটফটানি তার জিভে জাগালো শিহরণ। ঠিক এইসময় তীব্র খিদের মোচড় দিয়ে উঠলো পেট। অজান্তেই সজোরে বসে গেলো চোয়াল। মুড়মুড় করে শব্দ হলো নরম হাড় ভাঙার, উষ্ণ রক্তের মধুর স্বাদে ভরে গেলো মুখ। এরকম খাবারই এনে দেয় মা। ওটাও মাংস, এটাও মাংস। তবে তাজা হবার কারণে এটার স্বাদ আরো বেশি। একে একে সাতটা বাচ্চাকেই সাবাড় করলো সে। তারপর অবিকল মায়ের মতো করেই গাল চাটতে চাটতে বেরোতে লাগলো ঝোপ থেকে।

কিন্তু বেরোতে না বেরোতেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন একটা পালকের ঘূর্ণিঝড়। ঠোকর আর পাখার ঝাপটায় অস্থির হয়ে উঠলো সে। বাচ্চাদের অবস্থা দেখে উন্মাদ হয়ে গেছে মা-টারমিজান। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই একটা রাগ ভর করলো তার ওপর। গর্জে উঠে থাবা মারতে লাগলো সে, দাঁত বসিয়ে দিলো একটা ডানায়। ডানাটা ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে ছটফট করতে লাগলো মা-টার-মিজান, একইসাথে ঝাপটা চালিয়ে গেলো মুক্ত ডানা দিয়ে। উল্লসিত হয়ে উঠলো সে, অজানার যাবতীয় ভয় মুছে গিয়ে তার ওপর ভর করলো হত্যার নেশা। জীবিত ছোট ছোট জিনিসকে ইতোমধ্যেই শেষ করেছে সে, এবার খতম করবে একটা ধাড়িকে।

তাকে ঝোপের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো পাখিটা, উল্টো সে-ই পাখিটাকে টেনে নিয়ে চললো ফাঁকা জায়গার দিকে। তার সমস্ত রক্তবিন্দু আজ গরম হয়ে উঠেছে। পাখিটাকে হারাতেই হবে। এই লড়াইয়ের হারজিতের সাথে তার মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত।

কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিলো মা-টারমিজান। মাটিতে শুয়ে পরস্পর চেয়ে রইলো তারা পরস্পরের দিকে। খানিকটা দম নিয়ে আবার ঠোকর মারতে লাগলো পাখিটা। রক্তাক্ত নাক নিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে। উবে গেলো লড়াইয়ের উন্মাদনা, পাখিটাকে ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ছুটলো সে মাঠের ওপর দিয়ে।

অপর প্রান্তে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ঝোপের পাশে শুয়ে পড়লো সে। হঠাৎ মনে হলো, একটা বিপদ যেন খাঁড়ার মতো নেমে আসছে মাথার ওপর। সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর। প্রায় সাথেসাথেই সাঁ করে নেমে এলো একটা বাজপাখি, এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলো বাচ্চাটার প্রাণ।

মাঠের অন্য প্রান্তে তখন ডানা ঝাপটাচ্ছিলো মা-টারমিজান। শোকে বিহ্বল হবার কারণেই বাজপাখিটা এড়িয়ে গেলো তার চোখ। আকাশ থেকে নেমে এলো যেন একটা ডানাওয়ালা বিদ্যুৎ, এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো টারমিজানটার গলা চিরে, পরমুহূর্তেই তাকে সুদ্ধ উড়াল দিলো বাজপাখি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বোঝা গেলো, যারা জীবন্ত তাদের গায়ে মাংস আছে। মাংস জিনিসটা খেতেও সুস্বাদু। কিন্তু জীবন্ত জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো বড়ো তারা বাধা দিতে পারে। ছোটগুলো নিরাপদ। সুতরাং খেতেই যদি হয়, টারমিজানের বাচ্চা খাওয়াই

ভালো। পক্ষান্তরে বড়ো টারমিজানকে না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য বাজপাখিটা না নিয়ে গেলে সে আরেক বার লড়ে দেখতো মা-টারমিজানের সাথে। তবে ওরকম পাখি নিশ্চয় আরো পাওয়া যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছুলো স্রোতস্বিনীর পাড়ে। এর আগে সে কখনোই পানি দেখেনি। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। এবড়ো-খেবড়োও নয় জায়গাটা। সাহস করে আরো কয়েক ধাপ এগোতেই সে ভেসে যেতে লাগলো স্রোতের টানে। নাকমুখ দিয়ে ঢুকলো কন-কনে পানি। দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো সে। তবে কি সে মারা যাচ্ছে? অবশ্য মৃত্যু কী জিনিস, সে এখনো জানে না। কিন্তু অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের মতোই মনের দূরতম প্রান্তে মৃত্যুর একটা বোধ তার রয়েছে। পৃথিবীতে যতোরকম আঘাত আছে, তার মধ্যে মৃত্যুই সবচেয়ে কঠিন।

একটু পরেই মাটি ঠেকলো পায়ে। আর ডুবতে হলো না। যেন সেই খুশিতেই সে সাঁতরে চললো অপর তীরের দিকে। এর আগে সে কখনো সাঁতার কাটেনি, অথচ অভ্যেসটা যেন তার জন্মগত।

মাঝামাঝি যেতেই আবার সে ভেসে চললো স্রোতের টানে। থেকেই চলে গেলো পানির নিচে, থেকেই ওপরে উঠলো, আর ধাক্কা খেলো ডুবন্ত পাথরের সাথে। প্রত্যেক ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে।

এক স্রোতস্বিনী থেকে সে গিয়ে পড়লো আরেক স্রোতস্বিনীতে। কিন্তু এখানকার স্রোত তাকে ভাসিয়ে না নিয়ে পৌঁছে দিলো তীরের কাছের নুড়ির ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে তীরে উঠেই শুয়ে পড়লো সে। তার বিশ্বাস একটা বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছে। পানি

জীবিত নয়, অথচ নড়তে পারে। এখন থেকে কোনো জিনিস চোখে দেখার সাথেসাথেই সেটার সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ ধারণা গড়ে তোলা চলবে না। আগে ভালো করে বুঝতে হবে, তারপর বিশ্বাসের প্রশ্ন।

হঠাৎ তার মনে পড়লো মায়ের কথা। পৃথিবীতে ওরকম জিনিস আর একটাও নেই। জন্মের পর আজকের মতো খাটুনি তার কোনো-দিনই হয়নি। শরীরের পাশাপাশি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মনটাও। মায়ের কথা মনে হতেই একাকিত্বের একটা বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এখনই গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে মায়ের কোল ঘেঁষে। যথাসম্ভব দ্রুতপায়ে সে এগিয়ে চললো গুহা অভিমুখে।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ ভয়াবহ একটা চিৎকার শুনতে পেলো সে। পরক্ষণেই বিদ্যুতের মতো একটা হলুদ শিখা চলে গেলো তার সামনে দিয়ে। জানোয়ারটা ছোট, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। এবারে সে দেখলো ওইরকমই আরেকটা জানোয়ার, তবে একেবারেই ছোট্ট। তাকে দেখার সাথেসাথে পালানোর চেষ্টা করলো খুদে জানোয়ারটা। কিন্তু তার আগেই থাবা দিয়ে ওটাকে উল্টে দিলো সে। অদ্ভুত একটা শব্দ করলো বাচ্চাটা। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে এলো হলুদ বিদ্যুতের শিখা। আবার শোনা গেলো সেই ভয়াবহ চিৎকার, আর তারপরেই জ্বালা করে উঠলো ঘাড়ের একটা পাশ।

আর্তচিৎকার ছেড়ে পেছনে সরে যেতেই বাচ্চাটার প্রায় ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো মা-বেজি, বাচ্চাসহ অদৃশ্য হয়ে গেলো ঝোপঝাড়ের আড়ালে। অবাক হয়ে গেলো সে। এতোটুকু জিনিস এতো ব্যথা দিতে পারে! সে জানে না, আকার হিসেবে বিচার করলে তাবৎ বুনো প্রাণীর মধ্যে বেজিই সবচেয়ে হিংস্র এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।

আবার ফিরে এলো মা-বেজিটা। হিংস্র চিৎকারে ভয় পেলো সে,

কিন্তু পান্টা চিৎকার করতে ছাড়লো না। একটুও পরোয়া না করে আরো এগিয়ে এলো বেজিটা। লাফ দিলো। তার অনভ্যস্ত চোখ বেজিটাকে অনুসরণ করতে পারলো না। পরমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ দাঁত বসে গেলো গলার চামড়া ভেদ করে।

প্রথমে লড়াই করতে চাইলো সে, তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠলো পালাবার জন্যে। কিন্তু বেজিটা তাকে ছাড়লো না। পরিষ্কার বোঝা গেলো, গলার মোটা রগটাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

হয়তো সেদিনই মারা যেতো ধূসর বাচ্চাটা। এই গল্পও আর লিখতে হতো না। কিন্তু যথাসময়ে ঝোপঝাড় ভেঙে এসে উপস্থিত হলো মা-নেকড়ে। চোখের পলকে বাচ্চাটাকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেজিটা। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো অল্পের জন্যে। গলার বদলে তার দাঁত চেপে বসলো নেকড়েটার চোয়ালের চারপাশে। বিদ্যুৎগতিতে মাথা ঝাঁকালো মা-নেকড়ে। কামড় শিথিল হয়ে গেলো বেজিটার, সাথেসাথে দেহটা উঠে গেলো শূন্যে। এবং মাটিতে পড়ার আগেই শক্তিশালী চোয়ালের প্রচণ্ড চাপে বেরিয়ে গেলো তার প্রাণবায়ু।

আজ মাতৃস্নেহের যেন একটা আলাদা পরিচয় পেলো বাচ্চাটা। মাকে পেয়ে সে যতোটা খুশি হয়েছে তার চেয়ে তাকে পেয়ে অনেক বেশি হয়েছে মা। বেজিটাকে শেষ করেই মা ছুটে এলো বাচ্চার কাছে, ক্ষতস্থানগুলো চেটে দিতে লাগলো পরম স্নেহে। তারপর দু'জনে মিলে বেজিটাকেড় সাবা করে ফিরে গেলো গুহায়। ঘুমিয়ে পড়লো।

আট

মাংসের আইন

পরের দু'টো দিন শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিলো বাচ্চাটা। তৃতীয় দিন বেরিয়ে বেজির বাচ্চাটাকে খুঁজে পেলো সে। চটপট ওটাকে খেয়ে সে রওনা দিলো আবার। তবে আজ আর পথ হারালো না। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হবার পর ঠিক ঠিক ফিরে এলো গুহায়। এভাবে প্রতিদিন সে বেরিয়ে পড়তে লাগলো অভিযানে। এবং প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়তে লাগলো তার অভিযানের এলাকা।

নিজের শক্তি আর দুর্বলতা সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা জন্মাচ্ছে তার। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কোথায় সাহসী হতে হবে, আর কোথায় গুটিয়ে নিতে হবে নিজেকে। তবে প্রায় সবসময়েই সচেতন থাকা ভালো।

পথভ্রষ্ট কোনো টায়মিজানকে পেলে সে ছেড়ে কথা বলে না। কাঠ-বিড়ালের ওপরও তার ভীষণ রাগ। তবে সবচেয়ে বেশি রাগ মুঞ্জ-বার্ডের ওপর। এই বজ্জাত পাখিগুলোরই কোনো এক বংশধর ঠোকর মেরেছিলো তার নাকে।

অবশ্য আশেপাশে অন্য কোনো মাংসাশী প্রাণীর উপস্থিতি টের

পেলে মাথা গরম করার মতো বোকামি সে করে না। বাজপাখি চোখে পড়ার সাথেসাথে সে আত্মগোপন করে ঝোপে। ইদানীং হাঁটতে গিয়ে আর টলোমলো করে না বাচ্চাটা। মায়ের মতোই সন্তর্পণে সবার চোখ এড়িয়ে হাঁটতে শিখেছে সে।

টারমিগানের সাতটা বাচ্চা আর খুদে বেজিটার পর শিকারের ব্যাপারে তার ভাগ্য আর খোলেনি। একটা কাঠবিড়াল শিকার করার বড়ো শখ হয় তার। এই শয়তানগুলো কিচিরমিচির করে তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয় সবাইকে। কিন্তু পাখির মতোই এরা গাছে উঠতে পারে। সুতরাং মাটিতে থাকা অবস্থায় অলক্ষিতে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া এদের ধরার আর কোনো উপায় নেই।

মায়ের ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা। শিকারে বেরোলেই তার জন্যে মাংস নিয়ে আসে মা, কখনো ব্যর্থ হয় না। আর যে-কোনো ব্যাপারে মা অকুতোভয়। মা তার কাছে শক্তির প্রতিমূর্তি। যতোই বড়ো হচ্ছে, এই শক্তির পরিচয় পাচ্ছে সে। ইদানীং চড়চাপড়গুলো । আর আস্তে মারে না। তাই অনুগত থাকতে বাধ্য হচ্ছে সে।

আবার এসে গেলো দুর্ভিক্ষ। ঘুম বিশ্রাম হারাম করে মাংসের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে শুকিয়ে গেলো মা।

আগে শিকারকে সে মনে করতো এক ধরনের খেলা। কিন্তু এখন তাকে শিকার করতে হচ্ছে প্রাণের তাগিদে। বারবার ব্যর্থ হচ্ছে কিন্তু এই ব্যর্থতাও তাকে করে তুলছে অভিজ্ঞ। কাঠবিড়াল, বুনো ইঁদুর, মুজ-বার্ড আর কাঠঠোকরাদের চালচলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট ধারণা হয়েছে তার। বাজপাখিকেও সে আর ভয় পায় না। ওগুলো'ও মাংসের একেকটা পিণ্ড, যা দিয়ে পেট ভরানো চলে। কিন্তু এখন বাজপাখিই এড়িয়ে চলে তাকে। হতাশা আর খিদের যন্ত্রণায় ঝোপের ভেতরে ঢুকে

কেঁদে ফেলে সে।

অবশেষে একদিন কেটে গেলো দুঃসময়। মাংস নিয়ে এলো মা। কিন্তু এরকম মাংস সে আগে কখনো দেখেনি। আকারে তার সমান হলেও সে চিনতে পারলো না যে, বাচ্চাটা লিংক্সের। মা তার জন্যে আস্ত একটা বাচ্চা এনেছে, এতেই সে খুশি। ধারণাও করতে পারলো না, মায়ের পেট ভরাতে জীবন দিতে হয়েছে লিংক্সের বাদবাকি বাচ্চা-গুলোকে। মাংসের প্রত্যেকটা গ্রাস বাড়িয়ে তুললো তার আনন্দ। জানতেও পারলো না, তার মুখের এই গ্রাস জোগাতে কতোটা মরিয়া হতে হয়েছে মাকে।

ভরা পেট আলস্যের জন্ম দেয়। মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুম ভাঙলো ভয়াবহ গর্জনে। মাকে এতো ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়তে সে কখনোই শোনেনি। সামনে তাকাতেই দেখলো, বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গুহামুখে গুঁড়ি মেরে আছে বিরাট এক প্রাণী। অজা-ন্তেই সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গেলো তার। আর ঠিক তখনই রক্ত-হিম-করা এক গর্জন ছাড়লো জানোয়ারটা।

সাহসে ভর করে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলো সে। তৎক্ষণাৎ একটা থাবড়া মেরে তাকে আড়াল করে দাঁড়ালো মা। গুহার ছাদ নিচু বলে লাফ দিতে না পেরে ছুটে এলো মা-লিংক্স। পরক্ষণেই শুরু হয়ে গেলো ঘোর লড়াই। বাচ্চাটা অবশ্য এই লড়াইয়ের প্রায় কিছুই দেখতে পেলো না। গর্জন আর পাল্টা গর্জনে থরথর করে কাঁপতে লাগলো গুহা। কামড়ের পাশাপাশি ধারালো নখের আঘাতে নেকড়েকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে লাগলো মা-লিংক্স, পক্ষান্তরে নেকড়েটা ব্যবহার করলো শুধুই দাঁত।

একবার লাফিয়ে উঠে লিংক্সটার পেছনের একটা পা কামড়ে ধরে

খুলতে লাগলো সে। তার এই খুদে প্রচেষ্টাও অনেক সাহায্য করলো মাকে। তারপর হঠাৎ বদলে গেলো লড়াইয়ের গতি, দুই জানোয়ারের নিচে চাপা পড়লো সে। আবার উঠে শত্রুর দিকে ছুটে যাবার আগে সামনের থাবা দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানলো লিংক্সটা। ছিটকে গিয়ে গুহার দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো সে, কাঁধের মাংস চিরে বেরিয়ে পড়েছে হাড়। লড়াইটা আরো কতোক্ষণ চললো, সে ঠিক বলতে পারবে না। তবে একসময় লিংক্সটার পা কামড়ে ধরা অবস্থায় সে আবিষ্কার করলো নিজেকে।

অবশেষে মারা পড়লো লিংক্সটা। মা-নেকড়েও তখন মুমূর্ষু। কোনো-মতে সন্তানের ক্ষত চেটে দিয়ে শত্রুর মৃতদেহের পাশেই শুয়ে পড়লো সে। একদিন একরাত কেটে গেলো, নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। পানি খাবার প্রয়োজনে দু'একবার ছাড়া পুরো একটা সপ্তাহ গুহার বাইরেই গেলো না সে। তারপর একটু সেরে উঠতে দু'জনে মিলে চেটেপুটে খেলো লিংক্সটাকে।

কাঁধের ক্ষতের কারণে আরো কয়েকদিন খুঁড়িয়ে হাঁটলো বাচ্চাটা। কিন্তু ইতোমধ্যেই বদলে গেছে তার পরিচিত পৃথিবীর চেহারা। এখন তার প্রতিটা পদক্ষেপে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাস। লিংক্সটার সাথে মায়ের লড়াই তাকে করে তুলেছে দুঃসাহসী। অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর পায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে সে এবং বেঁচে ফিরে এসেছে। তাই অজানার রহস্য ছাড়া এখন আর কিছুকে সে পরোয়া করে না।

এরপর থেকে শিকারে মাকে শুধু সঙ্গই দিলো না সে, নিজের ভূমিকাটুকুও পালন করতে লাগলো যথাযথভাবে। শিকারের পাশা-পাশি সে শিখে নিলো মাংসের আইন। পৃথিবীতে মাত্র দু'জাতের প্রাণী আছে। একদিকে শুধু সে আর তার মা, অন্যদিকে বাদবাকি

সবাই। তবে অন্য জাতটার মধ্যে আবার দু'টো ভাগ আছে। এক-ভাগের প্রাণীগুলো ছোট দুর্বল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শিকারী হলেও তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু অন্যভাগের প্রাণীগুলো বড়ো আর শক্তিশালী। এরা সুযোগ্ পেলে তার কিংবা তার মায়ের দফা রফা করে দিতে পারে। আর এই শ্রেণীবিভাগের সূত্র ধরেই আই-নের জন্ম। কারণ মাংসই জীবনধারণের প্রধান শর্ত। জীবনও একতাল মাংসপিণ্ড মাত্র। এবং একজীবন নির্ভর করে থাকে আরেক জীবনের ওপর। তবে যতো শ্রেণীবিভাগই করা হোক, মোটামুটিভাবে দু'টো শ্রেণী আছে প্রাণীদের—খাদক আর খাদ্য। হয় কাউকে খেয়ে ফেলো নয়তো নিজেই হয়ে যাও কারো খাবার।

চারপাশের সবাই মেনে চলছে এই খাদক আর খাদ্যের আইন। খেয়েছে টারমিজানের বাচ্চাগুলোকে। মা-টারমিজানকে খেয়েছে বাজ-পাখি। সুযোগ পেলে বাজপাখিটা তাকেও ছাড়তো না। কিন্তু বড়ো হয়ে সে-ই আবার খেতে চেয়েছে বাজপাখিটাকে। লিংক্সের বাচ্চা খেয়েছে সে। ধাড়ি লিংক্সটাকেও খেয়েছে সে আর মা, অথচ মারা না পড়লে হয়তো লিংক্সটাই খেয়ে ফেলতো তাদের। জন্মসূত্রেই সে খুনী। মাংসই তার একমাত্র খাদ্য। কোনো মাংস দৌড়ে বেড়ায়, কোনোটা ওড়ে, কোনোটা গাছে চড়ে, কোনোটা আবার গর্তে ঢোকে। তবে এমন মাংসও আছে যেটা পালিয়ে না গিয়ে তাকেই তেড়ে আসে।

মাংসের আইনের পাশাপাশি আছে আরো ছোট ছোট আইন। টিকে থাকার প্রয়োজনে এগুলোও শিখতে হয়, মেনে চলতে হয়। আসলে গোটা পৃথিবীটাই এক পরম বিস্ময়। রাগ লড়াই শিকার—মোটকথা যাবতীয় প্রাণচঞ্চলতার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে অফুরন্ত আনন্দ।

কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম আর তৃপ্তিও আছে জীবনে।

ভরপেট খেয়ে রোদে বসে বসে ঢোলা—এ-যেন পরিশ্রমেরই পুরস্কার। পরিশ্রমের মাঝেই জীবনের সার্থকতা। তাই নিজের প্রতিকূল পরিবেশের সাথে কোনো বিরোধ নেই তার। এই পরিবেশের মাঝে বেড়ে উঠতে পেরেই সে যথেষ্ট সুখী, গর্বিত।

নয়

আগুনের সৃষ্টিকর্তা

হঠাৎ করেই জিনিসগুলোর একেবারে সামনে এসে পড়লো বাচ্চাটা। তার নিজের অসতর্কতার জন্যেই ঘটলো এই ঘটনা। গতকাল সারাটা রাত মাংসের খোঁজে কাটানোর ফলে সকালে সে যখন পানি খেতে গিয়েছিলো তখনো ঘুমের রেশ ছিলো চোখে। তাছাড়া এই জলাশয়টার কাছে সে আগেও অনেকবার এসেছে, কখনোই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি।

ঝড়ে উপড়ে পড়া পাইনটার পাশ কাটিয়ে, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েক-পা এগোতেই গন্ধ পেলো সে। ঠিক সামনে উবু হয়ে বসে আছে অদ্ভুত পাঁচটা জন্তু। তাকে দেখেও লাফিয়ে উঠলো না জন্তুগুলো, দাঁত বের করলো না, এমনকি গর্জনও ছাড়লো

না। বরং স্থির হয়ে বসে রইলো অদ্ভুত ভঙ্গিতে। জীবনে এই প্রথম মানুষ দেখলো ধূসর রঙের বাচ্চাটা।

নড়লো না সে-ও। সহজাত প্রবৃত্তি বারবার তাকে পালাতে বলছিলো, কিন্তু জীবনে প্রথমবারের মতো তার ভেতরে জেগে উঠলো বিপরীত এক প্রবৃত্তি। শ্রদ্ধামিশ্রিত একটা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো সে, আর এই অনুভূতিই তাকে নিশ্চল করে দিলো।

আগে কখনো মানুষ দেখেনি বাচ্চাটা, তবু তার রক্তের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে মানুষের পরিচয়। শুধু তার অনুভূতি নয়, তার পূর্বপুরুষদের সম্মিলিত অনুভূতির সাহায্যে সে বুঝতে পারছে, এরাই সমস্ত প্রাণীদের প্রভু। বড়ো নেকড়ে হলে হয়তো পালাবার চেষ্টা করতো সে। কিন্তু যেহেতু নিতান্তই একটা বাচ্চা, প্রচণ্ড ভয়ে অবশ হয়ে এলো তার শরীর।

একজন ইণ্ডিয়ান এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লো তার ওপরে। ভয়ে মাটির সাথে একেবারে লেপটে গেলো বাচ্চাটা। অবশেষে একেবারে মৃত্যু ধরে এসেছে অজানা সেই জানোয়ার! লোম খাড়া হয়ে গেলো তার, ঠোঁটদু'টো পেছনে সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো ঝকঝকে দাঁত। বাড়ানো হাতটা কিছুক্ষণ তার ওপরে ঝুলে রইলো নিয়তির মতো, তারপর হেসে ফেললো ইণ্ডিয়ানটা। বললো, 'দেখেছিস! কেমন শাদা দাঁত!'

অন্য ইণ্ডিয়ানরাও হেসে উঠে ধরে নিয়ে আসতে বললো বা।-টাকে। হাতটা ধীরে ধীরে আরো নেমে আসতে তার ভেতরে শুরু হয়ে গেলো প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব। থেকেই তার ইচ্ছে হলো লড়াই করার, থেকেই আত্মসমর্পণের। শেষমেষ দুই প্রবৃত্তির সাথে একটা সমঝোতায় আসলো সে। হাতটা মাথা ছুঁইছুঁই হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইলো, তারপর

বসিয়ে দিলো দাঁত। প্রায় সাথেসাথে মাথার পাশে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়লো সে। মুহূর্তে উবে গেলো লড়াইয়ের ইচ্ছে, কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা। কিন্তু লোকটার রাগ তখনো কমেনি, আবার আঘাত এসে পড়লো মাথার আরেক পাশে। উবু হয়ে বসে ডুকরে উঠলো সে।

হেসে উঠলো চার ইণ্ডিয়ান, হাতে কামড় খাওয়া লোকটাও বাদ গেলো না। তারপর পাঁচজনে মিলে ঘিরে ধরলো বাচ্চাটাকে। চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো অত্যন্ত পরিচিত একটা শব্দ। শব্দটা ইণ্ডিয়ানরাও শুনেছে, কিন্তু বুঝতে পারেনি। মা আসছে। তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে ছুটে আসছে মা—হিংস্র, অকুতোভয়। শেষ একটা জোর চেঁচানি ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

গজরাতে গজরাতে এসে পৌঁছুলো মাদি নেকড়েটা, বাচ্চার অমঙ্গল আশঙ্কায় তার চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর।

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো একজন ইণ্ডিয়ান, 'কিচ্!' শব্দটা শোনার সাথেসাথে সমস্ত হিংস্রতা ভুলে লেজ নাড়তে লাগলো মাদি নেকড়েটা।

'কিচ্!' এবারে ধমকে উঠলো নেকড়েটা।

আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়লো মাদি নেকড়েটা। হিংস্র মা হঠাৎ এভাবে শান্ত হয়ে গেলো কেন, বুঝতে পারলো না বাচ্চাটা। ভয় তাহলে সে অযথা পায়নি, তার অপরাজেয় মা পর্যন্ত ভয় পায় এই মানুষ-জন্তুদের!

যে-লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছিলো, সে কাছে এসে একটা হাত রাখলো মাদি নেকড়েটার মাথায়। থাবা মারা কিংবা গর্জে ওঠার বদলে আরো জড়োসড়ো হয়ে গেলো নেকড়েটা। এবার অন্য লোকগুলোও এগিয়ে

এসে ঘিরে ধরলো তাকে—মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, চাপড় মারলো পিঠে। কাউকে কিছু বললো না জানোয়ারটা। মানুষ-জন্তুগুলো চিৎকার করছে বটে, কিন্তু সে-চিৎকারে ভয় পাবার মতো কিছু নেই ভেবে ধীরে ধীরে বাচ্চাটা গিয়ে দাঁড়ালো মায়ের পাশ ঘেঁষে।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' বলে উঠলো এক ইণ্ডিয়ান। 'ওর বাবা খাঁটি নেকড়ে হলেও মা ছিলো কুকুর। তাই ওর চালচলন অনেকটা কুকুরের মতো।'

'এক বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিলো সে, তাই না, গ্রে বীভার?' বললো দ্বিতীয় ইণ্ডিয়ান।

'ওর পালাবার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না, স্যামন টাং,' জবাব দিলো গ্রে বীভার। 'ছুঁড়িকের কলে খাবার মতো এক টুকরো মাংসও ছিলো না কুকুরগুলোর।'

'উপায়ান্তর না দেখে সে ভিড়ে গিয়েছিলো নেকড়েদের দলে,' বললো তৃতীয় ইণ্ডিয়ান।

'তা-ই হবার কথা, থ্রী ইগলস্,' এগিয়ে এসে বাচ্চাটার গায়ে হাত রাখলো গ্রে বীভার, 'এটাই তার প্রমাণ।'

মৃদু গর্জন ছাড়লো বাচ্চাটা, সাথেসাথে ঘুসি পড়লো মাথায়। চুপ করে গেলো বাচ্চাটা। কানের পেছনদিকে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো গ্রে বীভার।

'কিচ্ই ওর মা,' বললো গ্রে বীভার। 'কিন্তু বাবা নিশ্চয়ই কোনো নেকড়ে। তাই কুকুরের চেয়ে নেকড়ের স্বভাবই ওর মধ্যে বেশি। ব্যাটার দাঁত দেখেছো, কেমন ঝকঝকে শাদা। আজ থেকে আমি ওকে ডাকবো হোয়াইট ফ্যাং বলে। ও আমারই কুকুর। কারণ কিচ্ ছিলো আমার ভাইয়ের কুকুর, আর ভাইটাও মারা গেছে।'

হোয়াইট ফ্যাং

অবাক চোখে মানুষ-জন্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো হোয়াইট ফ্যাং। আরো কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করলো জন্তুগুলো। তারপর গ্রে বীভার এসে তাকে নিয়ে গিয়ে বাঁধলো একটা পাইন গাছের সাথে।

হাত বাড়িয়ে স্যামন টাং চিৎ করে দিলো ওকে। উদ্বিগ্নচোখে তাকিয়ে রইলো কিচ্। আবার ভয় পেলো হোয়াইট ফ্যাং। মৃদু গর্জন না করে থাকতে পারলো না সে, কিন্তু কামড় দেবার সাহস দেখালো না। পেটে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো হাতটা। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো সে। তাছাড়া এভাবে চিৎ হয়ে সবগুলো পা আকাশের দিকে তুলে থাকাও খুব হাস্যকর। বিদ্রোহ করে উঠলো তার সমস্ত প্রকৃতি, তবু চুপ করে রইলো সে। এই মানুষ-জন্তুগুলোর ক্ষমতা বড়ো বেশি। আবার মৃদু গর্জন ছাড়লো সে কিন্তু এবারে কেন যেন মার খেতে হলো না। সুড়সুড়িও আর লাগছে না বরং একটা আরাম বোধ হচ্ছে। কানের পেছনে আরো কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে যখন উঠে পড়লো স্যামন টাং, মানুষ-জন্তুগুলোর প্রতি আর কোনো ভয়ই রইলো না ওর।

কিছুক্ষণ পর একটা কোলাহল ভেসে এলো দূর থেকে। শব্দগুলো যে মানুষ-জন্তুর, বুঝতে অসুবিধে হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুকুর, তাঁবুর সরঞ্জাম আর বাচ্চাকাচ্চাসহ এসে পড়লো জন চল্লিশেক ইণ্ডিয়ান।

হোয়াইট ফ্যাং এর আগে কখনো কুকুর দেখেনি। তবে দেখার সাথেসাথে সে বুঝতে পারলো, চেহারা সামান্য আলাদা হলেও এরা তার নিজেরই জাত, স্বভাবে এরা নেকড়ের মতোই। হোয়াইট ফ্যাং আর কিচ্কে দেখামাত্র তেড়ে এলো কুকুরগুলো। শুরু হলো কামড়া-কামড়ি। বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো কিচ্। পাল্টা

কামড় দেয়া ছাড়া উপায় রইলো না তারও। একটু পরেই কানে ভেসে এলো মানুষ-জন্তুর চিৎকার, গদার বাড়ির শব্দ, আর আহত কুকুরের গোঙানি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। দেখলো, গদার বাড়ি মেরে আর পাথর ছুঁড়ে কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ-জন্তুরা। এদের রকমসকমই সে বুঝে উঠতে পারলো না এখনো। এরাই একমাত্র জন্তু যারা লড়াইয়ের প্রয়োজনে দাঁত বা নখ ব্যবহার করে না। তারই জাতের হাত থেকে তাকে রক্ষাও করলো এরা। আইন শুধু তৈরিই করেনি এই মানুষ-জন্তুরা, আইনের যথাযথ প্রয়োগও শুধু এরাই জানে। গদা পাথর প্রভৃতি মৃত জিনিসও প্রাণ ফিরে পায় এদের হাতে। যে পাথরকে সে সবসময় পড়ে থাকতেই দেখেছে, সেগুলোকেও এরা রূপান্তরিত করতে পারে উড়ন্ত অস্ত্রে!

যারা এরকম অসম্ভব, ধারণাতীত ক্ষমতার অধিকারী তারাই বুঝি ঈশ্বর। অবশ্য ঈশ্বর সম্পর্কে হোয়াইট ফ্যাং কিছুই জানে না। ঈশ্বর তার কাছে এমন একটা জিনিস, যাকে ধরাছোঁয়া যায় না, আর যার শক্তির কোনো সীমা নেই। মানুষ-জন্তুরা অনেকটা সেরকমই, যারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে পুরো জগতকে বিস্মিত এবং আতঙ্কিত করে দু'হাতে ছুঁড়ে চলে পাথরের পর পাথর।

কতগুলো চাটতে চাটতে ভাবতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। এই প্রথম সে বুঝলো, দলগত হিংস্রতা কাকে বলে। বস্তুত এর আগে 'দল' জিনিসটার সাথেই পরিচয় ছিলো না ওর। আপন জাত বলতে সে বুঝতো একচোখো মা আর নিজেকে। অথচ তার জাতের আরো অনেকে আছে এই পৃথিবীতে। তাদের সাথে পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু কী জঘন্য সেই পরিচয়ের পা।। মানুষ-জন্তুরা না বাঁচালে এতোক্ষণ

তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো তারই জাতভাইয়েরা। মানুষ-জন্তুদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, তবু মাকে বেঁধে রাখাটা সে মেনে নিতে পারেনি। তাকেও বেঁধে রেখেছে এরা। এই বন্ধন একটা গণ্ডী টেনে দিয়েছে তার এতোদিনের স্বাধীন জগতটাতে।

ইণ্ডিয়ানরা যখন তাঁবু তুলে রওনা দিলো, তখন আরো নিরস্ত হলো হোয়াইট ফ্যাং। কারণ একেবারে পুঁচকে একটা মানুষ-জন্তু দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে মাকে।

স্রোতস্বিনী, উপত্যকা, এমনকি তার এতোদিনের চেনা জগতটাও পেরিয়ে গেলো মানুষ-জন্তুরা। অবশেষে ওরা গিয়ে থামলো ম্যাকেঞ্জি নদীর তীরে। বিভিন্ন আকারের ক্যানু বাঁধা রয়েছে এখানে-ওখানে, তীর জুড়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে সারি সারি মাছ।

মানুষ-জন্তুদের সবকিছুই বড়ো আলাদা, অন্যরকম। তাঁবু খাটানোটাই কি কম বিস্ময়কর! একটার সাথে আরেকটা বাঁশ জোড়া দিয়ে তার সাথে কাপড় আর চামড়া লাগিয়ে যেন একটা দানব সৃষ্টি করে এরা। তার তো ভয়ই লাগে জিনিসটার নিচে যেতে। মনে হয়, এই বুঝি হুড়মুড়িয়ে খুলে পড়লো মাথার ওপর।

তবে কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়টা কেটে গেলো তার। কারণ সে দেখলো, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাঁবুর নিচ দিয়ে অহরহ যাতায়াত করছে, অথচ কিছুই হচ্ছে না। অবশেষে সাহস করে একদিন সে গিয়ে দাঁড়ালো তাঁবুর কাছে। কিছুই ঘটলো না। ক্যানভাসটা শুঁকলো, পুরোটাতেই কেমন মানুষ-মানুষ গন্ধ। ক্যানভাসটা দাঁতে কামড়ে ধরে মৃদু টান দিলো সে। সামান্য দুলে ওঠা ছাড়া আর কিছুই হলো না। মজাই লাগলো তার। ধীরে ধীরে সে বাড়াতে লাগলো টানের জোর। একসময় পুরো তাঁবুটা দুলে ওঠায় ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো এক

মহিলা। এক দৌড়ে মায়ের কাছে ফিরে এলো হোয়াইট ফ্যাং।

একটু পরেই আবার মায়ের কাছ থেকে সরে গেলো সে। ইদানীং বাঁধা থাকায় মা আর তাকে অনুসরণ করতে পারে না। খানিকটা এগোতেই দেখা হলো তার চেয়ে সামান্য বড়ো একটা কুকুরের বাচ্চার সাথে। নাম—লিপ-লিপ।

একে নিজের জাত, তায় বাচ্চা বলে বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়েই এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু তাকে দেখামাত্র দাঁত বের করলো লিপ-লিপ। বাধ্য হয়ে দাঁত বের করতে হলো হোয়াইট ফ্যাংকেও। তারপর দু'জনে ঘুরতে লাগলো গোল হয়ে। কিছুক্ষণ ঘোরার পর ব্যাপারটাকে যখন খেলা মনে করতে শুরু করেছে হোয়াইট ফ্যাং, ঠিক তখনই চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধে একটা কামড় দিয়েই আবার সরে গেলো লিপ-লিপ। লিংক্সের থাবায় যে জায়গাটা জখম হয়েছিলো, কামড়টা ঠিক সেখানেই পড়ায় আর্তনাদ করে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। পরক্ষণেই রাগে অন্ধ হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো লিপ-লিপের ওপর।

কিন্তু ইতোমধ্যেই বার ছয়েক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে লিপ-লিপের। আবার তার ছোট ছোট দাঁতগুলো বসে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর গায়ে। আবার। শেষমেষ রণে ভঙ্গ দিয়ে নির্লজ্জের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে মায়ের কাছে পালিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

জিভ দিয়ে সারা গা চেটে দিতে দিতে কিচ্ বাচ্চাটাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যেন তার কাছ থেকে সে আর সরে না যায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কয়েক মিনিট পরেই আবার উঠে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। এবারে সে মুখোমুখি হলো গ্রে বীভারের। কাঠ আর শুকনো শ্যাওলার ওপর উবু হয়ে কী যেন করছে মানুষ-জন্তুটা। মুখ দিয়ে শব্দ করছে গ্রে বীভার, কিন্তু সে-শব্দে ভয় পাবার মতো কিছু না থাকায়

আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

কয়েকজন মহিলা আর শিশু আরো কিছু কাঠ আর গাছের ডাল এনে রাখলো গ্রে বীভারের কাছে। একটু পরেই তার হাতের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো কুয়াশার মতো অদ্ভুত একটা জিনিস, দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার রঙ হয়ে গেলো সূর্যের মতো উজ্জ্বল। গুহার মধ্যে আলোকিত দেয়ালটা যেমন ওকে সবসময় টানতো, তেমনি এক অমোঘ আকর্ষণে জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। চাপা হাসি ভেসে এলো গ্রে বীভারের কণ্ঠ থেকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শিখাটাকে চাটার চেষ্টা করলো সে।

অসাড় হয়ে গেলো জিভ, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে পেছনে সরে এলো হোয়াইট ফ্যাং। বাচ্চাকে সাহায্য করতে না পারায় অক্ষম ক্রোধে গর্জে উঠলো কিচ্। হাঁটু চাপড়াতে চাপড়াতে হেসে গড়িয়ে পড়লো গ্রে বীভার। একে একে তাঁবুর সবাইকে ডেকে ঘটনাটা বললো সে, দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেলো হাসির এক হুল্লোড়।

এর আগেও আহত হয়েছে হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু এই সূর্য-রঙা জিনিসটার মতো ব্যথা তাকে আর কেউ দেয়নি। সে যতো কাঁদলো, ততোই হাসির মাত্রা বেড়ে গেলো মানুষ-জন্তুগুলোর। জিভ দিয়ে পোড়া নাকটা চাটার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু জিভটাও ঝলসে গেছে বিশ্রীভাবে। আবার কেঁদে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং।

তারপর হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেলো। ওই হাসির অর্থ সে বুঝতে পেরেছে। সূর্য-রঙা জিনিসটা তাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে সত্যি, কিন্তু মানুষ-জন্তুগুলোর ওই হাসির যন্ত্রণা যেন তার চেয়েও বেশি। লজ্জায় মাথা নিচু করে সে পালিয়ে এলো কিচের কাছে। এখানে সতোগুলো জন্তু আছে, তার মধ্যে শুধু এই জন্তুটাই তার অবস্থা দেখে

হাসেনি ।

গোধূলি পেরিয়ে একসময় নেমে এলো রাত। হোয়াইট ফ্যাং তখনো বসে আছে মায়ের কোল ঘেঁষে। নাক আর জিভের খসুনি পুরোপুরি থামেনি, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো এক অসুবিধে দেখা দিয়েছে। কেমন যেন ফাঁকা লাগছে বুকের ভেতরটা। মন বারবার ফিরে যেতে চাইছে স্রোতস্বিনী আর গুহার সেই শান্ত পরিবেশে। এখানে জীবন বড়ো বেশি কোলাহলময়। একনাগাড়ে কথা বলে চলেছে মানুষ-জন্তুরা, সেইসাথে চলেছে কুকুরগুলোর খেয়োখেয়ি আর অবিরাম চিৎকার। ভীষণ এই জীবনের ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে তার।

তাঁবুর পাশ দিয়ে অনবরত যাতায়াত করছে মানুষ-জন্তুরা, বসে বসে দেখছে হোয়াইট ফ্যাং। তাদের চেয়ে এরা যে সত্যিই উৎকৃষ্ট, তা সে অনেক আগেই বুঝেছে। এদের শক্তির কোনো তুলনা নেই। এমন কোনো কাজ নেই, যা এরা পারে না। প্রভুত্ব করার জন্যেই যেন এদের জন্ম। এরা এমনকি আগুনের সৃষ্টিকর্তা। এরা ঈশ্বর!

দশ

বন্ধন

অভিজ্ঞতা বাড়ছে হোয়াইট ফ্যাং-এর। মা যতোক্ষণ বাঁধা থাকে, তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে সে। মানুষ-জন্তুদের যতো চিনছে, ততোই বেড়ে চলেছে তার বিস্ময়।

এরা যে ঈশ্বর, তা বুঝতে খুব বেশি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন পড়ে না। দু'পেয়ে এই ঈশ্বরগুলো যেমন রাগ করতে পারে, তেমনি ভালোও বাসে। সর্বোপরি, এদের সব কিছুতে লুকিয়ে রয়েছে রহস্য। কেটে গেলে এমনকি রক্তও ঝরে এদের গা থেকে। চুপিচুপি গিয়ে সে চেখে দেখেছে, সে-রক্তের স্বাদও অন্যান্য রক্তের মতোই।

একবার শুধু নাম ধরে ডাকতেই এদের বশ্যতা স্বীকার করেছে মা। সুতরাং সে-ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ওই পথেই। মানুষ-জন্তুরা হাঁটলে সে সরে যায় তাদের সামনে থেকে, ডাকলে কাছে যায়, ধমকালে মাথা নিচু করে, যেতে বললে দ্রুত কেটে পড়ে। কারণ এদের সমস্ত ইচ্ছের পেছনে রয়েছে শক্তি—যে শক্তি আঘাত হানে, যে শক্তি নিজেদের প্রকাশিত করে ঘুসি, গদা, উড়ন্ত পাথর আর চাবুকের মাধ্যমে।

অন্য কুকুরগুলোর মতোই এখন মানুষ-প্রভুর ইচ্ছে-অনিচ্ছেই নিয়ন্ত্রিত করে তার গতিবিধি। তার এই শরীর যেন তৈরিই হয়েছে এদের গদার বাড়ি আর লাথি খাবার জন্যে, যাবতীয় অত্যাচার সহ্য করবার জন্যে। তবু তার মনে হয়, কোনো কাজ নিজে করার ঝুঁকি না নিয়ে এদের ওপর নির্ভর করাই ভালো।

কিন্তু এই বশ্যতা সে একদিনে স্বীকার করেনি। দিনের পর দিন চুপিচুপি সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বনের প্রান্তে। সুদূর থেকে ভেসে আসা একটা ডাক তাকে অস্থির করে তুলেছে। শেষমেষ ফিরে এসে জিভে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুলে সে চেটে দিয়েছে মায়ের মুখ।

তাঁবুর জীবনযাত্রাও দ্রুত বুঝে নিচ্ছে হোয়াইট ফ্যাং। সবচেয়ে লোভী হলো বুড়ো কুকুরগুলো। মাংস বা মাছ ছড়িয়ে দিলে এদের আর কোনো হুঁশ থাকে না। এক টুকরো মাংস বা অতিরিক্ত একটা হাড় দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে হিসেবী হলো পুরুষেরা, সবচেয়ে নিষ্ঠুর শিশুরা, আর সবচেয়ে দয়ালু মহিলারা। আরেকটা বিষয়ে চোখ খুলে গেছে হোয়াইট ফ্যাং এর। এতোদিন পর্যন্ত সে জানতো, পৃথিবীতে মায়ের স্নেহের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কয়েকটা কুকুর-মার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার পর সে বুঝেছে, অন্তত এই মা-গুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো।

তবে লিপ-লিপের চেয়ে বড়ো দুঃস্বপ্ন তার জীবনে আর নেই। বিন্দুমাত্র সুযোগ পাবার সাথেসাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শয়তানটা। ঝাঁপিয়ে সে-ও পড়ে, কিন্তু পেরে ওঠে না কখনোই। তাকে শায়েস্তা করার মতো শাস্তি যেন আর কিছুতে পায় না লিপ-লিপ।

এমনকি তাঁবুর অন্যান্য কুকুরের বাচ্চাগুলোর সাথে তাকে খেলতে পর্যন্ত দেয় না শয়তানটা। কিন্তু ক্রমাগত এই অত্যাচার হোয়াইট

ফ্যাংকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে না। বরং ধীরে ধীরে তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে লিপ-লিপের বিরুদ্ধে।

জীবনের এই প্রতিকূলতার সাথে লড়তে গিয়েই যেন হোয়াইট ফ্যাং হয়ে উঠলো একটা পাকা চোর। চুরির নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে সে। জানে, কীভাবে তাঁবুর সবার এমনকি লিপ লিপের চোখ এড়িয়ে মাছ বা মাংসের টুকরো নিয়ে সটকে পড়তে হয়।

প্রতিশোধ নেয়ারও একটা কৌশল বের করলো হোয়াইট ফ্যাং। লিপ-লিপকে ভুলিয়েভালিয়ে একদিন সে নিয়ে গেলো মায়ের কাছে।

রাগে অন্ধ হয়ে তাড়া করতে করতে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেললো লিপ-লিপ, এভাবেই একসময় সে গিয়ে পড়লো কিচের গায়ের ওপর। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো কিচ্, পরক্ষণেই তার দাঁত বসে গেলো শত্রুর গায়ে। বাঁধা ছিলো কিচ্, তবু সহজে তার হাত থেকে রেহাই পেলো না লিপ-লিপ।

শেষমেষ যখন ছাড়া পেলো, লিপ-লিপের সারা শরীর তখন রক্তাক্ত। কোনোমতে খাড়া হয়ে কেঁউকেঁউ করে কেঁদে উঠলো সে, কিন্তু কান্নাটাও সম্পূর্ণ করতে পারলো না। ছুটে এসে তার পেছনের পায়ে দাঁত বসিয়ে দিলো হোয়াইট ফ্যাং। লড়াইয়ের কোনো ইচ্ছেই আর অবশিষ্ট ছিলো না লিপ-লিপের, লেজ দাবিয়ে ছুটলো সে নিজের তাঁবুর দিকে। পিছনে পিছনে ছুটে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। লিপ-লিপকে বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত পাথর ছুঁড়তে লাগলো মহিলারা।

পালাবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই ভেবে একদিন কিচের বাঁধন খুলে দিলো গ্রে বীভার। খুশিতে ডগোমগো হয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। মায়ের সাথে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো যেখানে সেখানে। যতোক্ষণ মা কাছে থাকলো, আশেপাশে এলো না লিপ-লিপ। শুধু

তা-ই নয়, লিপ-লিপকে দেখে দাঁত বের করলো সে। কিন্তু লিপ লিপ অতো বোকা নয়, ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলো ব্যাপারটা। সে জানে, উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার খাতিরে হোয়াইট ফ্যাংকে তার একা পাওয়া দরকার।

সেদিনই বিকেলে মায়ের সাথে হোয়াইট ফ্যাং গেলো বনের ধারে। সেই গুহা আর স্রোতস্বিনী আবার আকুল করে তুললো ওকে। কিন্তু মা-যে আর এগোতে চায় না। মাকে ভোলাবার অনেক চেষ্টা করলো সে, কিন্তু আর এক ধাপও নড়লো না কিচ্। শেষমেষ বাধ্য হয়ে মায়ের সাথে আবার তাঁবুতে ফিরে এলো হোয়াইট ফ্যাং।

বনের ভেতর থেকে একটা ডাক ভেসে আসে। ডাকটা যে কিচ্ শুনতে পায় না, তা নয়। কিন্তু কিচের কাছে বনের চেয়ে ওই আগুন আর মানুষের আকর্ষণ এখন অনেক বেশি।

বার্চ গাছের ছায়ায় বসে হোয়াইট ফ্যাং-এর মনে পড়ে স্বাধীনতার সেই দিনগুলোর কথা। সেরকম দিন আবার কখনো আসবে কিনা, ঠিক বুঝতে পারে না সে। তার কান খাড়া হয়ে যায় বনের ডাক শোনার জন্যে। তবে এ-কথা ঠিক যে, বন বা তাঁবুর চেয়ে মায়ের আকর্ষণ অনেক বেশি। তার ছোট্ট এই জীবনে মা-ই সবচেয়ে বড়ো নির্ভরতা।

বুনো জীবনে শাবক খুব বেশি দিন মায়ের সাথে থাকে না। কিন্তু মানুষের হাতে পড়লে সে-সময়টা হয়ে পড়ে আরো সংক্ষিপ্ত। হোয়াইট ফ্যাং-এর ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। থ্রী ঈগল্‌সের কাছে বেশ কিছু ঋণ ছিলো গ্রে বীভারের। সুতরাং থ্রী ঈগল্‌স্ যখন চলে যেতে চাইলো গ্রেট স্লেভ হ্রদের দিকে, গ্রে বীভার সে-ঋণ শোধ করলো এক টুকরো লাল কাপড়, একটা ভালুকের চামড়া, বিশটা বুলেট আর কিচ্‌কে দিয়ে। থ্রী ঈগল্‌স্ যখন কিচ্‌কে তুলতে গেলো

ক্যানুতে, সে-ও চেষ্টা করলো মায়ের সাথে উঠে পড়তে। ধাক্কা দিয়ে ওকে পেছনে সরিয়ে দিলো শ্রী ঈগলস্। দেখতে দেখতে তীর থেকে খানিকটা সরে গেলো ক্যানু। হঠাৎ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং, প্রাণপণে সাঁতরে চললো ক্যানু লক্ষ্য করে। পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো গ্রে বীভার, কিন্তু আজ ঈশ্বরের আদেশ শুনতেও রাজি নয় সে।

অথচ নিজের আদেশ পালিত হতে দেখাই ঈশ্বরদের অভ্যেস। একটা ক্যানু নিয়ে রওনা দিলো গ্রে বীভার। কাছে পৌঁছে হোয়াইট ফ্যাংকে ঘাড় ধরে পানি থেকে টেনে তুললো সে, কিন্তু তখনতখনই ছেড়ে দিলো না। একহাতে ঝুলিয়ে রেখে আরেক হাতে লাগালো প্রচণ্ড মার।

ঘুসি খেতে খেতে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘড়ির দোলকের মতো দুলতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। প্রথমটায় বিস্মিত হলো সে, তারপর ভীত। কিন্তু ক্রমাগত মার চলতে থাকায় শেষমেষ রেগে গেলো সে। ঈশ্বরের একেবারে মুখোমুখি হয়ে বের করলো দাঁত। ফলে রেগে আগুন হয়ে গেলো ঈশ্বর।

মারের চোটে সারা শরীর অবশ হয়ে আসতে চাইলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। ক্রমাগত চিৎকার করে গেলো সে, কিন্তু মার থামলো না। এর আগেও লাঠির দু'একটা বাড়ি কিংবা পাথরের ঘা খেয়েছে সে, কিন্তু আজকের তুলনায় সেসব নিতান্তই তুচ্ছ। ধীরে ধীরে সাহস উবে গেল, আবার তাকে দখল করে নিলো ভয়।

শেষমেষ থামলো গ্রে বীভার, তার কান্নায় সন্তুষ্ট হয়েই যেন ছুঁড়ে ফেলে দিলো ক্যানুর তলায়। তারপর তুলে নিলো দাঁড়। ধীরে ধীরে কাছে যেতে চাইলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু প্রচণ্ড এক লাথি তাকে

ছিটকে দিলো দূরে। মুহূর্তের মধ্যে আবার মেজাজ গরম হয়ে গেলো, গ্রে বীভারের পায়ে দাঁত বসিয়ে দিলো হোয়াইট ফ্যাং।

এবার যে মার শুরু হলো আগে [illegible]ও তুচ্ছ হয়ে গেলো তার কাছে। হাত-পা ছাড়াও দাঁড় ব্যবহার কর[illegible] লাগলো গ্রে বীভার। দেখতে দেখতে ফুলে উঠলো সমস্ত শরীর। লাথির পর লাথি এসে পড়লো, কিন্তু কামড়ানোর সাহস আর পেলো না সে। এই মানুষ-প্রভুরা বড়ো ভয়ঙ্কর, কোনো পরিস্থিতিতেই আর এদের বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না। এদের বিরুদ্ধাচরণ করার চেয়ে বড়ো অপরাধ বুঝি [illegible]থবীতে আর নেই।

তীরে নামার পরেও আরো কিছুক্ষণ চললো দাঁড়ের বাড়ি আর লাথি। অবশেষে মার থামতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কোনো-মতে উঠে দাঁ[illegible]লো হোয়াইট ফ্যাং, আর সেই মুহূর্তে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো লিপ-লিপ। সেদিন কী হতো, বলা কঠিন। কারণ লড়াই তো দূরের কথা, বাধা দেয়ার ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট ছিলো না তার। কিন্তু দু'একটা কামড় দিতে না দিতেই গ্রে বীভারের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়লো লিপ-লিপ। মানুষ-প্রভুদের অনেক কিছুই বুঝতে পারে না হোয়াইট ফ্যাং। একটু আগেই যে তাকে নির্দয়ভাবে মারলো, এখন সে-ই আবার তাকে বাঁচাতে চায়! তবে এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না, শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাটা মানুষ-প্রভুরা নিজের হাতেই রাখতে চায়। ছোট জাতের কোনো জানোয়ারের দ্বারা এই ক্ষমতার ব্যবহার তাদের ঘোরতর অপছন্দ।

রাতে শুয়ে শুয়ে মায়ের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু কান্নার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেলো গ্রে বীভারের। ফলে আবার কয়েকটা চড়-চাপড় জুটলো ওর

কপালে। এরপর থেকে ঈশ্বরেরা আশেপাশে থাকলে সে শোক করতো নিচু স্বরে। তবে মাঝেমাঝে বনের ধারে গিয়ে মায়ের শোকে গলা ছেড়ে করুণ সুরে বিলাপ করে সে হাল্কা করতো বুকের ভার।

গুহা আর স্রোতস্বিনীর কথা আবার মনে পড়লো তার। কিন্তু পালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। মা-তো আর নেই ওখানে। তার চেয়ে এখানেই অপেক্ষা করে দেখা যাক। ঈশ্বরেরা যেহেতু চলে যায়, আবার ফিরেও আসে, ওদের সাথে একদিন হয়তো ফিরে আসবে মা।

তবে মানুষ-প্রভুদের সাথে যে দাসত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে সে, বন্ধনটা খুব একটা মন্দ নয়। সব সময় শেখার মতো কিছু না কিছু করে চলেছে এরা। তাছাড়া এদের সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস যে বশ্যতা, সেটা বুঝতে পেরেছে সে। স্রেফ বশ্যতা স্বীকার করে চললে সহজেই এদের চোখে পড়া যায়, সেইসাথে এড়ানো যায় মার।

মাঝেমাঝে নিজের হাতে দু'এক টুকরো মাংস ওকে তুলে দিতে লাগলো গ্রে বীভার। খেয়াল রাখলো, যাতে অন্য কোনো কুকুর সে-মাংসে ভাগ বসাতে না পারে। মহিলাদের হাত থেকে পাওয়া রাশিরাশি মাংসের চেয়ে এই এক টুকরো মাংসের মূল্য যে অনেক বেশি, বুঝতে মোটেই অসুবিধে হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। ধীরে ধীরে বদ-মেজাজী প্রভুটির সাথে গড়ে উঠতে লাগলো বিশেষ একটা সম্পর্ক।

বন্ধনটা যে ক্রমশ জোরদার হচ্ছে, তার সচেতন মন সেটা টের পায় না। সেখানে মা-কে হারানোর দুঃখই এখনো অনেক বেশি প্রবল। হোয়াইট ফ্যাং অপেক্ষা করে, কবে ফিরে আসবে মা—কবে আবার ফিরে পাওয়া যাবে ফেলে আসা সেই স্বাধীনতার জীবন।

এগারো

জাতিভ্রষ্ট

হোয়াইট ফ্যাং-এর জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ করে তুললো লিপ-লিপ। হিংস্রতা ওর জন্মগত, কিন্তু সে-হিংস্রতা পুরোপুরি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো লিপ-লিপের জন্যেই। এখন চুরি, অন্য কুকুরদের সাথে ঝগড়া ইত্যাকার যাবতীয় ঝামেলার মূলে থাকে হোয়াইট ফ্যাং। তার শয়তানিই এখন মানুষ-প্রভুদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

তাঁবুতে তার জাতের আরো অনেকে থাকা সত্ত্বেও সে জাতিভ্রষ্ট। একটা কুকুরও তাকে দেখতে পারে না। সবাই মেনে চলে লিপ-লিপের নির্দেশ। সময় নেই অসময় নেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর। সে-ও ছেড়ে কথা বলে না। বেশির ভাগ কুকুরই একা লড়তে গেলে পেরে ওঠে না তার সাথে। কিন্তু এক কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ হোয়াইট ফ্যাং পায় না বললেই চলে।

দলবদ্ধ আক্রমণের মোকাবিলা করতে করতে দু'টো জিনিস খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছে সে। এক, কীভাবে অনেকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হয়। দুই, কোনো কুকুরকে একা পেলে কতো অল্প সময়ে

চরম আঘাত হানা যায়। এ ছাড়াও বিড়ালের মতো পা দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে লড়াইয়ের একটা কৌশল শিখে নিয়েছে সে। ফলে বয়স্ক কুকুররাও কাঁধের ধাক্কা দিয়ে তাকে সহজে ফেলে দিতে পারে না।

লড়াইয়ের আগে লোম ফুলিয়ে, পা শক্ত করে একটা ভূমিকা করে কুকুরেরা। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং এসবের ধার ধারে না। দেরি করার অর্থই হলো শত্রুকে দলভারী করার সুযোগ দেয়া। তাছাড়া লড়াইয়ে চমকের একটা আলাদা মূল্য আছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শত্রুর কাঁধ চিরে কিংবা কান ছিঁড়ে দিতে পারলে অর্ধেক জয় সম্পন্ন হয়।

সর্বোপরি কুকুরকে উল্টে ফেলে দিতে পারলে গলার সেই জায়গায় বসানো যায় দাঁত, যে জায়গা দিয়ে ধুকপুক করে বয়ে চলে জীবন। জায়গাটা ওকে কেউ চিনিয়ে দেয়নি। মারাত্মক ওই জায়গা আপনা-আপনিই চিনে নিয়েছে সে বংশগতির ধারায়।

অবশ্য চোয়ালে যথেষ্ট জোর তার এখনো আসেনি। কিন্তু ইতো-মধ্যেই অনেক কুকুর নিজ নিজ গলায় বয়ে বেড়াচ্ছে তার ক্ষুরধার দাঁতের চিহ্ন। একদিন বনের ধারে হঠাৎ একটা কুকুরকে একলা পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং, কয়েকবার মাটিতে ফেলার পর মুহূর্তের সুযোগে কেটে দিলো গলার মোটা রগটা। মহা হুলস্থুল হলো সে-রাতে। মৃত কুকুরের মালিক এবং তাঁবুর সমস্ত মহিলা এসে ঘিরে ধরলো গ্রে বীভারকে। হোয়াইট ফ্যাং-এর বিরুদ্ধে তাদের অভিযো-গের অন্ত নেই। কিন্তু এতো অভিযোগ সত্ত্বেও তাকে আগলে রাখলো গ্রে বীভার।

কুকুরের পাশাপাশি মানুষেরও ঘৃণার বস্তু হয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। এক দলের পরিবর্তে এখন তাকে মোকাবিলা করতে হয় দু'-দলের আক্রমণ। নিজের জাত তাকে দেখামাত্র দাঁত বের করে দাঁত আর

ঈশ্বরেরা ছুঁড়ে মারে লাঠি আর পাথর।

গর্জন করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। কাউকে সাবধান কিংবা আতঙ্কিত করাই গর্জনের উদ্দেশ্য, এটা হোয়াইট ফ্যাং জানে। পাশাপাশি তার এ-ও জানা আছে যে ঠিক কখন গর্জন ছাড়তে হয়। গর্জন করার সময় তার ভয়ঙ্কর মূর্তি বয়স্ক কুকুরদের পর্যন্ত চমকে তোলে। আর এই চমকে ওঠার ফলে একমুহূর্ত বেশি সময় পেয়ে যায় হোয়াইট ফ্যাং, লড়াইয়ের সময় যে-মুহূর্তটির সত্যিই কোনো তুলনা নেই।

কুকুরের বাচ্চাদের দলে হোয়াইট ফ্যাং-এর কোনো স্থান নেই। তবে এই শত্রুতার ফলে তাদেরও কম ক্ষতি হয়নি। দল ছেড়ে কখনো বাইরে যেতে পারে না তারা। বাইরে যাবার সাথেসাথে এসে হাজির হবে হোয়াইট ফ্যাং নামের সেই মূর্তিমান বিভীষিকা। শুধু লিপ-লিপ দলে থাকলেই যা একটু সাহস পায় তারা। ভুলক্রমে কোনো বাচ্চা যদি চলে যায় নদীর দিকে, হয় প্রাণে মারা পড়ে সে, নয়তো ত্রাহি চিৎকারে জানিয়ে তোলে তাঁবুর সবাইকে।

হোয়াইট ফ্যাং-এর প্রতিহিংসা এমনই ভয়ঙ্কর যে, দল বেঁধে আক্রমণ করেও অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। একবার তাড়া শুরু করলে মাথা আর ঠিক থাকে না কুকুরের বাচ্চাগুলোর। শত্রুকে তাড়া করতে করতে কে কার আগে যেতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং এর মাথা সব সময়েই স্থির। দৌড়োতে দৌড়োতেই মাঝেমাঝে পিছু ফিরে পরিস্থিতিটা বুঝে নেয় সে। যদি দেখে কোনো কুকুরের বাচ্চা দল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে, মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ায় হোয়াইট ফ্যাং। চোখের পলকে হানে চরম আঘাত, তারপর দলের অন্য কুকুরগুলো এসে পড়ার

াগেই আবার চলে যায় নাগালের বাইরে।

খেলা ছাড়া থাকতে পারে না কুকুরের বাচ্চা। সুতরাং হোয়াইট ফ্যাংকে তাড়া করাই হয়ে দাঁড়ালো তাদের প্রধান খেলা। তাড়া করে কখনোই হোয়াইট ফ্যাং-এর নাগাল পায় না, তবু তাড়া করা চাই-ই চাই। ছুটতে ছুটতে একসময় বনে ঢুকে পড়ে হোয়াইট ফ্যাং. আর বনে ঢুকলে তার নাগাল পাওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য। কুকুরগুলোকে পথভ্রষ্ট করেও এক ধরনের মজা পায় সে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ নেমে পড়ে পানিতে, তারপর খানিক দূরে গিয়ে আবার উঠে ঢুকে পড়ে ঝোপের ভেতর। খুঁজে না পেয়ে কুকুরগুলোর তখন সে কী চিৎকার।

যুগপৎ মানুষ এবং পশুর নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে হোয়াইট ফ্যাং নিজেও হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। শক্তকে ভক্তি করা আর নরমের ওপর নির্যাতন চালানোই পৃথিবীর হাজার নীতির এক নীতি। গ্রে বীভার ঈশ্বর এবং অধিকতর শক্তিশালী বলেই তাকে ভক্তি করে হোয়াইট ফ্যাং, আর দুর্বল বলেই নির্যাতন চালায় কুকুরদের ওপর। পৃথিবীতে দুর্বলের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তাছাড়া একই জাতের হলেও কুকুরদের চেয়ে সে অনেক উন্নত। দ্রুততা, কৌশল, ভয়ঙ্করত্ব, সহ্যশক্তি কোনো দিক দিয়েই কুকুরেরা তার সাথে তুলনীয় নয়। তবে এসব গুণ তাকে অর্জন করতে হয়েছে। এগুলো না থাকলে বৈরী এই পরিবেশে সে টিকতে পারতো না।

বারো

ঈশ্বরের অনুসরণ

সে-বছর শরৎকালে পালাবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। কয়েক দিন থেকেই বেশ একটা হৈচৈ চলছে, বাঁধাছাঁদা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মানুষ-প্রভুরা। আসলে তাঁবু গুটিয়ে ইণ্ডিয়ানরা এখন বেরিয়ে পড়বে শিকারের সন্ধানে। মালপত্র ক্যানুতে তোলা হলো। দেখতে দেখতে কিছু ক্যানু হারিয়ে গেলো নদীর বাঁকে। উৎসুক চোখ মেলে সমস্ত লক্ষ্য করলো হোয়াইট ফ্যাং।

তারপর সুযোগমতো একসময় ঢুকে পড়লো বনে। একটা ঘন ঝোপে শুয়ে ঘুমোতে লাগলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘুম ভাঙলো মানুষের চিৎকারে। তার নাম ধরে ডাকছে গ্রে বীভার ওর স্ত্রী আর ছেলে মিট-শা।

ভয়ে কাঁপতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। গ্রে বীভারের কাছে ছুটে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো মনটা, কিন্তু অনেক কষ্টে সে দমন করলো নিজেকে। তারপর ডাকাডাকির শেষ রেশটুকুও যখন হারিয়ে গেলো, সে বেরিয়ে এলো বাইরে। মুক্তির আনন্দে কিছুক্ষণ ছুটোছুটি

করলো গাছপালার মাঝে, তারপর হঠাৎ করেই তাকে পেয়ে বসলো নিঃসঙ্গতার বোধ। ঘনায়মান অন্ধকারে থমথম করছে চারপাশ। এখানেই কোথাও বুঝি ওত পেতে আছে অজানা সেই দানব।

ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ। কিন্তু সে-ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আর আগুন নেই এখানে। খিদেও পেয়েছে, কিন্তু নেই মাংসের একটা টুকরো। একে একে তাঁবুর সমস্ত দৃশ্য ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। ওখানে বজ্জাত কুকুরগুলো ছিলো সত্যি, কিন্তু সেগুলোর পাশাপাশি ছিলো আগুন আর খাবার।

পরাধীন জীবন কাটাবার ফলে ইতোমধ্যেই অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে তার দায়িত্ববোধ। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গেছে সে। তাছাড়া চারপাশের নিস্তব্ধতাও যেন চেপে বসতে চাইছে ওর ওপর। তাঁবুতে কতো চিৎকার, হৈ-হল্লোড় ছিলো, কিন্তু শোনার মতো কিছুই নেই এখানে।

হঠাৎ বিশাল কী যেন একটা নড়ে উঠলো অন্ধকারের মাঝে। আঁতকে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। আসলে ওটা ছিলো একটা গাছের ছায়া। ছায়াটার উদ্দেশে মৃদু একটা গর্জন ছাড়লো সে, তারপরেই চুপ করে গেলো। কারণ এই গর্জন অজানা দানবটাকে আকৃষ্ট করতে পারে।

মাথার ঠিক ওপরে সরসর করে উঠলো একটা গাছ। তীরবেগে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। যতো শিগগির সম্ভব ফিরে যেতে হবে মানুষের আশ্রয়ে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় খোলা মাঠে বেরিয়ে এলো সে, কিন্তু কোনো গ্রাম তার চোখে পড়লো না। ইণ্ডিয়ানদের চলে যাবার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলো হোয়াইট ফ্যাং।

কিছু ন্যাকড়া এবং আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই জায়গা-

টায়। একাকিত্ব একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো তার কাছে। মনে হলো, এভাবে থ'কার চেয়ে মহিলাদের হাতের ঢিল, গ্রে বীভারের মার, এমনকি লিপ-লিপদের আক্রমণও অনেক ভালো।

ঘুরতে ঘুরতে যেখানটায় গ্রে বীভারের তাঁবু ছিলো, সেখানে গিয়ে পৌঁছুলো হোয়াইট ফ্যাং। তারপর ঠিক মাঝখানে বসে নাক তুললো চাঁদের দিকে। চরম এই নিঃসঙ্গতা আর মা-কে হারানোর কথা ভেবে তার গলা চিরে বেরিয়ে এলো করুণ এক আর্তনাদ।

ভোর হবার সাথেসাথে আতঙ্ক কেটে গেলো, কিন্তু একাকিত্বটা যেন চেপে বসলো আরো ভারী হয়ে। ফলে মনস্থির করতে খুব বেশি দেরি হলো না তার। অনুসরণ করতে হবে ঈশ্বরদের। নদীর তীর ধরে সারাদিন ছুটে চললো সে—ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন। অবশেষে শ্রান্তি যখন এলো, বংশগত অসাধারণ সহ্যশক্তি তার শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট ছোট নদী সাঁতরে পার হয়ে এগিয়ে চললো হোয়াইট ফ্যাং। যেভাবেই হোক খুঁজে পেতে হবে ঈশ্বরদের পদচিহ্ন।

নিজের জাতভাইদের তুলনায় হোয়াইট ফ্যাং অনেক বুদ্ধিমান। তবু এ-কথাটা তার মাথায় একবারও খেললো না যে, একই পথ ধরে না এগিয়ে একটু অন্যদিকে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত পদচিহ্ন।

রাত কেটে গিয়ে আবার এলো ভোর। হোয়াইট ফ্যাং তখনো ছুটছে। দুপুরের দিকে, একনাগাড়ে তিরিশ ঘণ্টা ছোটার পর ভীষণ খিদে পেলো তার। গত চল্লিশ ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি। পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। এদিকে কষ্টটা আরো বাড়ানোর জন্যেই যেন শুরু হয়েছে তুষারপাত।

গ্রে বীভার যেখানটায় তাঁবু খাটিয়েছে, আসলে সেখানে থামার

কোনো ইচ্ছেই ছিলো না তার। কিন্তু তার স্ত্রী ক্রু-কুচ হঠাৎ করে একটা মুজ দেখতে পাওয়ায় এবং মুজটা তার রাইফেলের গুলিতে মারা পড়ায় আর এগোবার ইচ্ছে হলো না। যদি আরো খানিকটা এগিয়ে যেতো গ্রে বীভার, তাহলে ছুটতে ছুটতেই মারা পড়তো হোয়াইট ফ্যাং, নয়তো গিয়ে ভিড়তো কোনো নেকড়ের দলে।

রাত নামার পর হঠাৎ তাজা একটা চিহ্ন দেখতে পেলো হোয়াইট ফ্যাং, আর সেই চিহ্ন ধরে খানিকটা এগোতেই তার কানে ধরা পড়লো মানুষের গলা। তাঁবুর কাছে পৌঁছুতে সে দেখলো, রান্না করছে ক্রু-কুচ, আর আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে কাঁচা এক টুকরো চর্বি খাচ্ছে গ্রে বীভার। তাজা মাংস! জিভে পানি এসে গেলো তার।

ভীষণ মার খেতে হবে, ভাবলো হোয়াইট ফ্যাং। তবে ঠাণ্ডায় আর ক্ষিদের যন্ত্রণায় আধমরা হবার চেয়ে সে-ও বরং ভালো।

মার খাবার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গুটিগুটি পায়ে হোয়াইট ফ্যাং এগিয়ে গেলো গ্রে বীভারের কাছে। তাকে দেখামাত্র চর্বি চিবোনো বন্ধ হয়ে গেলো গ্রে বীভারের। আঘাতের আশঙ্কায় নিজের অজান্তেই পিঠ শক্ত হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর, কিন্তু ওর পরিবর্তে নিজের চর্বির টুকরোটা অর্ধেক করলো গ্রে বীভার! চরম বিস্ময়ে প্রথমটায় ভয় পেয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং, তারপর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে কামড় বসালো চর্বিতে। এরপর তার জন্যে মাংস আনতে বললো গ্রে বীভার। খেয়াল রাখলো, যাতে কুকুরগুলো আবার ভাগ না বসায়। খেয়েদেয়ে গ্রে বীভারের পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। আগুনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলো, আগামীকাল থেকে আর হতভাগার মতো বনে বনে ঘুরতে হবে না। মানুষ-প্রভুদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সে, এখন থেকে তার সমস্ত ভাবনা প্রভুরাই ভাববে।

তেরো

চুক্তি

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গ্রে বীভার যাত্রা করলো ম্যাকেঞ্জি নদীর উজানে। একটা স্লেজ চালাবে সে নিজে, আর কুকুরের বাচ্চার টানা একটা স্লেজ চালাবে মিট-শা। এই প্রথম স্লেজ চালানোর হাতেখড়ি হচ্ছে তার।

ইতঃপূর্বে তাঁবুর অন্য কুকুরদের স্লেজ টানতে দেখেছে হোয়াইট ফ্যাং। সুতরাং তাকেও যখন লাগাম পরিয়ে দেয়া হলো, তেমন কিছু মনে করলো না সে।

সবসুদ্ধ সাতটা কুকুরের বাচ্চা আছে দলে। ন' থেকে দশ মাসের মধ্যে বয়স তাদের। শুধু হোয়াইট ফ্যাং-এর বয়স আট মাস।

কুকুরগুলো এমন কৌশলে বাঁধা হয়েছে যে, কোনো কুকুর যদি তার সামনের কুকুরটাকে কামড়াতে চায়, তাহলে গতি বাড়াতে হবে। আর এই গতি বাড়ানোর ফলে গতি বাড়াতে বাধ্য হবে তার পেছনের কুকুর। এভাবে গতি বেড়ে যাবে পুরো দলটার, স্লেজও ছুটবে জোরে।

মিট-শা বাবার মতোই বুদ্ধিমান। অতীতে লিপ-লিপের শয়-

তানিগুলো সে নিজের চোখেই দেখেছে। কিন্তু লিপ-লিপের মালিক তখন অন্য লোক ছিলো বলে দু'একটা পাথর ছোঁড়া ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। আর এখন লিপ-লিপ তার নিজের কুকুর। ফলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার যথেচ্ছ সুযোগ পেয়ে গেছে সে। ইচ্ছে করেই লিপ-লিপকে রেখেছে দলের সবার আগে। এতে দলপতি হবার সম্মান পেয়েছে লিপ-লিপ, কুকুরদের দৃষ্টিতে যার চেয়ে অসম্মানের কাজ আর দু'টো নেই। কারণ দলপতিকে তারা ঘৃণা করে।

দলের সামনে সামনে ছোটায় লিপ-লিপের লেজ আর ছুটন্ত পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না অন্য কুকুরগুলো। আর মুখটা সব সময় আড়ালে থাকায় ভয় একেবারেই কেটে যাবে তাদের। তাছাড়া একেবারে সামনে ছোটার ফলে তাদের মনে হবে, লিপ লিপ বুঝি তাদের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। এতে লিপ-লিপকে সময়ে-অসময়ে তাড়া করার একটা অভ্যেস তৈরি হবে তাদের মধ্যে, যে অভ্যেস ধীরে ধীরে দুর্বিষহ করে তুলবে লিপ-লিপের জীবন।

স্লেজ রওনা দেয়ার সাথেসাথে লিপ-লিপকে তাড়া শুরু করে কুকুরের বাচ্চাগুলো। আপন মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ায় মাঝেমধ্যে ঘুরে রুখে দাঁড়ায় সে, কিন্তু সাথেসাথে সপাং করে মুখের ওপর এসে পড়ে মিট-শার চাবুক। বাধ্য হয়ে আবার দৌড়োতে শুরু করে লিপ-লিপ। দলের অন্য কুকুরগুলোর মুখোমুখি তবু হওয়া যায়, কিন্তু ওই চাবুকের মুখোমুখি হওয়া সত্যিই বড়ো কঠিন। তবে কয়েক দিন পর কুকুরদের মুখোমুখি হবার সাহসও হারিয়ে ফেলে লিপ-লিপ। পেছনের কুকুরের তীক্ষ্ণ দাঁত থেকে পিঠ আর পাঁজর রক্ষা করাই এখন তার একমাত্র লক্ষ্য।

এতোকিছুর পরেও লিপ-লিপকে রেহাই দিলো না মিট-শা। দল থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে মাংস দিতে লাগলো সে। শুধু তা ই

নয়, মাংসের বরাদ্দ যখন নেমে এলো শূন্যের কোঠায়, তখন লিপ-লিপকে দূরে নিয়ে গিয়ে এমন ভান করতে লাগলো মিট-শা, যেন সমস্ত কুকুরকে বঞ্চিত করে প্রিয় কুকুরটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার দিচ্ছে সে।

বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে চললো হোয়াইট ফ্যাং। মা-কে আজ-কাল আর মনে পড়ে না বললেই চলে। সুতরাং মানুষ-প্রভুদের প্রত্যেকটা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই হয়ে উঠলো তার ধ্যান-জ্ঞান। অবশ্য নেকড়ে কিংবা বুনো কুকুরের ধর্মই তাই। এরা সহজে পোষ মানতে চায় না, কিন্তু একবার পোষ মানলে এদের মতো প্রভু-ভক্ত জানোয়ার খুঁজে পাওয়া ভার।

অন্য কুকুরগুলোর সাথেও একটা সম্পর্ক আছে তার। সে-সম্পর্ক সীমাহীন শত্রুতার। এক কামড়ের পরিবর্তে দশ কামড় দেয়াই সে-সম্পর্কের প্রথম এবং শেষ কথা। লিপ-লিপও এখন এড়িয়ে চলে সমস্ত কুকুরকে। স্লেজ টানার সময় শুধু নামেমাত্র দলপতি হয়ে থাকে সে। তাঁবুতে ফেরার সাথেসাথে অন্যান্য কুকুর ও হোয়াইট ফ্যাং-এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঘুরঘুর করে মিট-শা, গ্রে বীভার আর স্কু-কুচের আশেপাশে।

লিপ-লিপের পতনের পর অনায়াসে দলপতি হতে পারতো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই তার। পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, তাছাড়া দু'চোখে দেখতে পারে না কুকুরদের। ইদানীং বড়ো কুকুরেরাও তাকে ঘাঁটাতে চায় না। সবচেয়ে সাহসী কুকুরও চট্-পট্ খেয়ে ফেলে নিজের ভাগের মাংস। খাবার ব্যাপারে হোয়াইট ফ্যাংও যথেষ্ট চটপটে। নিজের মাংসটুকু শেষ করেই সে নজর দেয় অন্যের মাংসের দিকে।

কোনো কোনো কুকুর যে এতে আপত্তি করে না, তা নয়। কিন্তু ধারালো দাঁতের বিরুদ্ধে সে আপত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

নিজেদের দলের মধ্যে তারা যা খুশি করুক, তাতে হোয়াইট ফ্যাং-এর বলার কিছু নেই। কিন্তু তার ব্যাপারে নাক গলানো সে মোটেই পছন্দ করে না। এমনকি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা শক্ত করা কিংবা লোম ফোলানোটাও তার সহ্যের বাইরে।

মোটকথা, শক্তকে ভক্তি করা আর দুর্বলের ওপর নির্যাতন চালানোই তার প্রধান নীতি।

মাসের পর মাস কেটে গেলো। তবু যাত্রা শেষ হলো না গ্রে বীভারের। দিনরাত পরিশ্রমের ফলে শক্তি বেড়ে যাবার পাশাপাশি মানসিক গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। পৃথিবীর স্বরূপটা চিনে নিলো সে। এখানে দয়ামায়া বা ভালোবাসার কোনো স্থান নেই, চারদিকে শুধুই হিংস্রতার রাজত্ব।

গ্রে বীভারকেও সে ভালোবাসে না। গ্রে বীভার ঈশ্বর বটে, কিন্তু খুব নিষ্ঠুর ঈশ্বর। তবু শক্তির কারণে তাকে ভক্তি করে সে। গ্রে বীভার যদি তাকে কাছে বসিয়ে নরম নরম কিছু কথা বলতো, কিংবা হাত বুলিয়ে দিতো পিঠে, হয়তো ভালো লাগতো তার। কিন্তু এ-সব ব্যাপার গ্রে বীভারের ধাতেই নেই। কারণ সে নিজেই বেড়ে উঠেছে নির্মম পরিবেশে। শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনে গদা আর ঘুসি ব্যবহার করে সে। আর কিছু না বলে চুপ করে থাকাটাই তার পুরস্কার দেয়ার ধরন।

মানুষের হাতকে খুব ভয় করে হোয়াইট ফ্যাং। ওই হাত মাংস দেয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দেয় যন্ত্রণা। লাঠি কিংবা গদার বাড়ি, চড়, ঘুসি—সবই বর্ষিত হয় ওই হাত থেকে। শিশুদের হাত আরো নিষ্ঠুর। একবার তো এক শিশু গুঁতো দিয়ে তার একটা চোখ নষ্ট করে ফেলে-

ছিলো প্রায়। তারপর থেকে শিশুদের সে সহ্য করতে পারে না।

গ্রেট স্লেভ হ্রদের তীরের এক গ্রামে ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ করে ফেললো হোয়াইট ফ্যাং। এ-ধরনের গ্রামে পৌঁছুলে সাধারণত খাবারের সন্ধানে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় কুকুরেরা। তেমনি ঘুরতে ঘুরতে হোয়াইট ফ্যাং দেখলো, এক জায়গায় কুড়োল দিয়ে মুজের মাংস কাটছে একটা ছেলে। কুড়োলের ঘায়ে কিছু কিছু মাংস দূরে ছিটকে পড়ছে দেখে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে সেগুলো খেতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। সাথেসাথে কুড়োল রেখে একটা গদা তুলে নিলো ছেলেটা। ঠিক সময়মতো নজরে পড়ায় বিদ্যুদ্বেগে একপাশে সরে গিয়ে কোনোমতে নিজের মাথা বাঁচালো হোয়াইট ফ্যাং। তারপরেই দৌড়। গদা হাতে পিছুপিছু ছুটে এলো ছেলেটা। গ্রামটা একেবারে নতুন বলে একজায়গায় দু'টো তাঁবুর মাঝখান দিয়ে দৌড় লাগাতেই বোকা বনে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

পেছনদিকে মাটির পাড়। পথ বন্ধ। ফলে পালাতে হলে যে পথ দিয়ে এসেছে, সেতে হবে সে-পথেই। কিন্তু সেই পথ আগলেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো তার। কোনো অপরাধ তো সে করেনি! ছিটকে পড়া দু'এক টুকরো মাংস তো তারেরই প্রাপ্য। তবু অযথা ছেলেটা তাকে মারতে চায়। তারপর রাগের মাথায় কখন ঘটনাটা ঘটে গেলো, বোধহয় বুঝতেও পারলো না হোয়াইট ফ্যাং। ছেলেটাও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফালাফালা হয়ে গেলো তার গদা ধরা হাতটা।

পরক্ষণেই হুঁশ হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। এ কী করলো সে! ঈশ্বরের পবিত্র হাতে কামড় বসালো! কঠিন শাস্তির ভয়ে ছুটে গিয়ে সে মুখ লুকোলো গ্রে বীভারের কোলে। একটু পরেই এলো ছেলেটার

বাবা-মা। কিন্তু গ্রে বীভার, মিট-শা আর ক্লু-কুচ তর্ক করতে লাগলো তার পক্ষ নিয়ে। শেষমেষ বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলো ওরা। নতুন একটা শিক্ষা হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। ঈশ্বর অনেক আছে। প্রভেদও আছে ঈশ্বরে ঈশ্বরে। কিছু ঈশ্বর তার নিজস্ব, অন্যগুলো বাইরের। আর সব ঈশ্বরকেই যে মেনে চলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। নিজের ঈশ্বর ন্যায় করুক আর অন্যায়ই করুক, সব সয়ে যেতে হবে মুখ বুজে। কিন্তু অন্য ঈশ্বরদের অন্যায় সহ্য না করলেও চলে। মজার কথা হলো, ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে হলেও এই আইন ঈশ্বরেরই।

ওইদিনই নতুন আইন সম্বন্ধে আরেকটা অভিজ্ঞতা হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করতে বনে গিয়ে সেই ছেলে আর তার কয়েকটা বন্ধুর মুখোমুখি পড়ে গেলো মিট-শা। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর সবগুলো ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম মারতে শুরু করলো মিট-শাকে। প্রথমে ঘটনাটা দেখেও দেখলো না হোয়াইট ফ্যাং। কারণ ওটা ঈশ্বরদের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেলো, মিট-শা তো তার নিজস্ব ঈশ্বর। চোখের পলকে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছেলেগুলোর ওপর। মিনিট পাঁচেক পরেই রক্তাক্ত দেহে ছুটলো তারা যেদিকে দু'চোখ যায়। তাঁবুতে ফিরে মিট-শা যখন গল্পটা বললো, হোয়াইট ফ্যাং-এর জন্যে বেশি করে মাংস আনার হুকুম জারি করলো গ্রে বীভার।

এরপর থেকে প্রভুর পাশাপাশি প্রভুর সম্পত্তিও পাহারা দিতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে প্রভুর সম্পত্তি। এতে যদি ঈশ্বরের গায়েও দাঁত বসাতে হয়, দ্বিধা করবে না সে।

তবে হোয়াইট ফ্যাং লক্ষ্য করেছে, অন্য যেসব ঈশ্বর চুপিচুপি গ্রে

ভাঁড়ারের সম্পত্তিতে হানা দিতে আসে, তাদের প্রায় সবাই অত্যন্ত কাপুরুষ। তার উপস্থিতি টের পাবার সাথেসাথে উধাও হয়ে যায় নিশাচর সেইসব ঈশ্বরের দল।

মাসের পর মাস কেটে যায়। দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় পশু আর মানুষের চুক্তি। ইতঃপূর্বে যেসব নেকড়ে আর বুনো কুকুর কাজ করেছে এই চুক্তির অধীনে, তাদের মতো হোয়াইট ফ্যাংও সহজেই এর শর্তগুলো বোঝে। খাবার, আগুন, নিরাপত্তা আর সাহচর্যের বিনিময়ে ঈশ্বরের সম্পত্তি, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরকেও পাহারা দেবে সে। মেনে চলবে তাদের যাবতীয় আদেশ।

এই চুক্তির সাথে কর্তব্যপরায়ণতার একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, কিন্তু সে-কর্তব্যে ভালোবাসার কোনো স্থান নেই। আসলে ভালোবাসা কী জিনিস হোয়াইট ফ্যাং বোঝে না। কিচের কথা এখন বিস্মৃতপ্রায়। বনের কথাও সে আর মনে করতে চায় না। এখন যদি হঠাৎ মা-ও এসে পড়ে, চুক্তি রক্ষার খাতিরে নিজের ঈশ্বরকে ত্যাগ করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

চোদ্দ

দুর্ভিক্ষ

এপ্রিল মাসে গ্রে বীভার ফিরলো নিজের গ্রামে। লাগাম খুলে দেয়া হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। পুরো এক বছর বয়স হলো তার। এক বছরের কুকুরগুলোর মধ্যে শুধু লিপ-লিপই আকারে তার চেয়ে কিছুটা বড়ো। তার চামড়ার রঙ খাঁটি নেকড়েদের মতোই ধূসর। কিচের দিক থেকে কুকুরের রক্তের উত্তরাধিকার পেলেও তার কোনো ছাপ নেই হোয়াইট ফ্যাং-এর চেহারায়। বরং তার মানসিক গঠনে কুকুরদের কিছুটা প্রভাব রয়েছে।

গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে পূর্বপরিচিত অনেক ঈশ্বরকে দেখতে পেলো হোয়াইট ফ্যাং। কুকুরের যে বাচ্চাগুলোকে দেখে গিয়েছিলো, সেগুলোও ইতোমধ্যে তার মতোই বড়োসড়ো হয়ে উঠেছে। আর ধাড়ি যে কুকুরগুলোকে দেখে ভয়ে তার বুক কাঁপতো, এবারে সেগুলোর মাঝে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ালো সে।

বিশেষ করে বাসীক নামের একটা বুড়ো কুকুরকে দেখার সাথেসাথে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেতো হোয়াইট ফ্যাং। অথচ মাত্র এক বছরে

কী পরিবর্তনটাই না হয়েছে। চামড়া ঝুলে পড়েছে বাসীকের, আর তার শরীরে এসেছে শক্তির জোয়ার।

গ্রে বীভার একটা মুজ মারার পর নিজের শক্তির পরিচয় আরো ভালো করে পেলো হোয়াইট ফ্যাং। মাংস কাটাকাটির পর তার ভাগে পড়লো একটা খুর আর পায়ের সামনের দিকের হাড়। ঝোপের আড়ালে বসে আরাম করে হাড়টা চিবুচ্ছে হোয়াইট ফ্যাং, এমন সময় ছুটে এসে সেখানে হাজির হলো বাসীক। কিন্তু সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং, পরপর দু'বার কামড় খেয়ে লাফিয়ে নাগালের বাইরে সরে গেলো বাসীক।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো বাসীকের। সেদিনের হোয়াইট ফ্যাং-এর এতো সাহস! লোম ফুলিয়ে কড়া চোখে তাকালো সে। পুরনো আতঙ্কের স্মৃতিতে মাথা নিচু করলো হোয়াইট ফ্যাং।

আর ঠিক তখনই একটা ভুল করে বসলো বাসীক। সে যদি কড়া চোখে তাকিয়েই থাকতো, হয়তো হাড়টা রেখেই চলে যেতো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু কাঁচা মাংসের গন্ধ তাকে মাতাল করে তুললো। এগিয়ে হাড়টা শোঁকার জন্যে মাথা নামালো বাসীক।

আর সহ্য হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। চোখের পলকে ফালা-ফালা হয়ে গেলো বাসীকের একটা কান। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো বাসীক। কিন্তু আরো বিস্ময় বাকি ছিলো তার জন্যে। এবার ধাক্কা খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো সে, সাথেসাথে পরপর দু'বার কামড় পড়লো কাঁধের কাছটায়। হোয়াইট ফ্যাংকে ধরার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু বাতাস ছাড়া আর কিছু ধরতে পারলো না। পরমুহূর্তেই চিরে ফাঁক হয়ে গেলো তার নাকটা।

পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ উল্টো। এখন হোয়াইট ফ্যাং দাঁড়িয়ে আছে

হাড়টার কাছে, আর পালাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে বাসীক। ছোকরা ওই কুকুরের সাথে লড়াই করার দিন তার চলে গেছে। কিন্তু তাই বলে নিজের মর্যাদা বিসর্জন দিতে রাজি নয় সে। জায়গাটা ছেড়ে এমনভাবে চলে গেলো বাসীক, যেন ওই হাড়ের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। এমনকি হোয়াইট ফ্যাং-এর চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত কতগুলোও চাটলো না সে।

এই ঘটনার পর হোয়াইট ফ্যাং-এর মনোবল অনেক বেড়ে গেলো। বড়ো বড়ো কুকুরগুলোকে আর ভাই পায় না সে। অবশ্য তাই বলে সে যে ঝামেলা পছন্দ করে, তা নয়। কেউ তাকে না ঘাঁটালে সে-ও কাউকে ঘাঁটাবে না—এটাই তার নীতি।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে একেবারে নতুন এবং আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা হলো তার। শিকারীদের সাথে মুজ শিকার থেকে ফিরে এসে সে দেখলো, নতুন একটা তাঁবু পড়েছে গ্রামের প্রান্তে। তাঁবুটার কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই সে দেখতে পেলো কিচ্‌কে। ভাবলো, জানোয়ারটাকে সে যেন আগে কোথায় দেখেছে। তারপরেই মনে পড়ে গেলো সব। কিচ্‌ মৃদু গর্জে উঠতেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলো সে। ছোটবেলায় এমনি করেই তো ধমকাতো মা! আনন্দের আতিশয্যে এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। সাথেসাথে তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে চিরে গেলো তার গাল। পেছনে সরে এলো হোয়াইট ফ্যাং, হতবাক হয়ে গেছে সে।

তবে নিষ্ঠুর এই আচরণের জন্যে মোটেই দোষ দেয়া যায় না কিচ্‌কে। কোনো নেকড়ে-মা তার এক বছর বয়েসী বাচ্চাকে চিনতে পারে না। সুতরাং কিচের চোখে হোয়াইট ফ্যাং এখন শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং মা হিসেবে এই শত্রুর হাত থেকে সদ্যোজাত বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করা তার একান্ত কর্তব্য।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো একটা বাচ্চা। স্নেহের বশবর্তী হয়ে বাচ্চাটার গায়ের গন্ধ শুঁকলো হোয়াইট ফ্যাং। তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর আবার আঘাত হানলো কিচ্। না, একে আর কোনোমতেই মা বলা যায় না—ভাবলো সে। তাছা.! মা যখন তাকে কাছে যেতে দিতে চায় না, তারই বা কী দরকার পড়েছে কাছে যাবার।

হতভম্ব হয়ে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। তৃতীয় বার প্রচণ্ড আঘাত হানলো কিচ্, যেন তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। পালিয়েই এলো হোয়াইট ফ্যাং। লড়াই করলে অবশ্য মা তার সাথে পারতো না। কিন্তু মদ্দা হয়ে মাদির সাথে লড়াই করা চলে না।

মাসের পর মাস কেটে গেলো। আরো বড়ো, আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। বনে থাকলে সে হয়তো এতোদিন খাঁটি নেকড়েই হয়ে উঠতো। কিন্তু বনে না থেকে সে এসেছে মানুষের সাহচর্যে। কারণ ঈশ্বরই তাকে সৃষ্টি করেছেন অন্যভাবে। পরিবেশের প্রভাবে সে ধীরে ধীরে কুকুরের মতোই হয়ে উঠছে বটে, কিন্তু সে খাঁটি কুকুরও নয়, খাঁটি নেকড়েও নয়।

আর সম্ভবত চরিত্রগত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তার মেজাজ আর হিংস্রতা। এখন পারতপক্ষে কোনো কুকুর তার সামনে পড়তে চায় না।

আরেকটা জিনিস একেবারে সহ্য করতে পারে না হোয়াইট ফ্যাং। হাসি। মানুষের হাসি তার কাছে চরম ঘৃণার ব্যাপার। অবশ্য তারা যদি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে হাসলেই আগুন জ্বলে ওঠে মাথায়। গ্রে বীভারের হাসি তবু সহ্য করে সে। কারণ, এই মানুষটির আছে গদা আর বুদ্ধি। কিন্তু কোনো কুকুর হাসলে তার আর রক্ষা নেই।

হোয়াইট ফ্যাং-এর বয়স যখন তিন বছর, তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো ম্যাকেঞ্জি নদীর আশেপাশের অঞ্চলে। নদী থেকে হারিয়ে গেলো মাছ। উধাও হয়ে গেলো বল্গাহরিণ, মুঞ্জ আর খরগোশ। একের পর এক মারা পড়লো শিকারের পশু। খিদের জ্বালায় পাগল-প্রায় হয়ে সবল পশুরা খেয়ে ফেলতে লাগলো দুর্বলদের। কান্নার রোল উঠলো তাঁবুতে তাঁবুতে। মারা গেলো দুর্বল শিশুরা। বৃদ্ধরাও ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। শিকারে বেরিয়ে খালিহাতে ফিরতে ফিরতে চোখ কোটরে ঢুকে গেলো ইন্ডিয়ানদের।

জুতো আর দস্তানার নরম চামড়া চিবুতে লাগলো ঈশ্বরেরা। কুকুরেরা চিবুতে লাগলো লাগাম আর চাবুক। তারপর এক কুকুর খেতে লাগলো অন্য কুকুরকে। শেষমেষ যে ক'টা টিকে থাকলো, তারা পালিয়ে গেলো বনে।

হোয়াইট ফ্যাংও পালিয়ে গেলো। খিদের জ্বালায় সে এখন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতের মতো নিশ্চল হয়ে থেকে সে এমনকি কাঠবিড়াল পর্যন্ত ধরতে পারে।

কিন্তু বনে কাঠবিড়াল বেশি না থাকায় সে নজর দিলো ে । ইঁদুরের দিকে। বেজি ধরতেও দ্বিধা করলো না।

দুর্ভিক্ষ যখন চরমতম আকার ধারণ করলো, আবার সে ফিরে গেলো লোকালয়ে। কিন্তু দেখা দিলো না কাউকে। ফাঁদে কিছু ধরা পড়লে চুরি করে পালাতে লাগলো চুপিচুপি। একদিন এমনকি গ্রে বীভারের ফাঁদ থেকে খরগোশ চুরি করতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলো না সে।

তরুণ, কিন্তু অনাহারে হাড্ডিসার এক নেকড়ের সাথে একদিন দেখা হলো তার। অন্য সময় হলে হয়তো নেকড়েটার সাথে গিয়ে দলের অন্যান্য নেকড়ের সাথে যোগ দিতো সে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ বড়ো নিষ্ঠুর,

ভ্রাতৃত্ববোধ ভুলিয়ে দেয়। লড়াইয়ে নেকড়েটাকে পরাজিত করলো হোয়াইট ফ্যাং। তারপর খেয়ে ফেললো।

সম্ভবত ভাগ্যও তার প্রতি সুপ্রসন্ন। একবার দু'দিন ধরে একটা লিংগ খাবার পর শরীরে বেশ জোর পেলো সে। আর ঠিক তখনই হঠাৎ করে পড়ে গেলো একদল নেকড়ের সামনে। কিন্তু তাড়া করতে করতে শেষমেষ হাঁপিয়ে গেলো নেকড়েগুলোই। তখন সুযোগ পেয়ে ওদেরই একটাকে খতম করে দিলো হোয়াইট ফ্যাং।

এরপর উপত্যকা পেরিয়ে সে চলে গেলো জন্মভূমির দিকে। কিন্তু গুহায় ঢুকতেই গর্জে উঠলো কিচ্। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় মানুষ-প্রভুদের ত্যাগ করে সে-ও চলে এসেছে এদিকে। জন্ম দিয়েছে নতুন কয়েকটা বাচ্চার। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটা মাত্র বেঁচে আছে। সম্ভবত সে-টাও মারা যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। এরকম ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বাচ্চাকাচ্চারা সাধারণত বাঁচে না।

আবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো কিচ্। কিছু মনে করলো না হোয়াইট ফ্যাং। সে জানে, মা তাকে ভুলে গেছে। গুহা ছেড়ে রওনা দিলো সে। স্রোতস্বিনীটার কাছে পৌঁছুবার পর এগিয়ে চললো বাঁ-শাখা ধরে। অবশেষে লিংক্সের সেই পরিত্যক্ত গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলো পুরো একটা দিন।

গ্রীষ্মের প্রথমদিকে অনেকটা কমে এলো দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। আর এই সময়েই হঠাৎ একদিন তার দেখা হয়ে গেলো লিপ-লিপের সাথে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো দুই ঘোর শত্রু। দু'জনের চোখেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

গত এক সপ্তাহ ধরে পেট পুরে খাওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষের কোনো চিহ্নই নেই হোয়াইট ফ্যাং-এর শরীরে। লিপ লিপকে দেখামাত্র খাড়া

হয়ে গেছে তার সমস্ত লোম, বেরিয়ে পড়েছে ঝক্‌ঝকে দাঁত। সময় নষ্ট করলো না হোয়াইট ফ্যাং। পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলো লিপ-লিপ, কিন্তু তার আগেই উল্টে পড়লো কাঁধের ধাক্কা খেয়ে। আর মাটিতে পড়ার সাথেসাথে হোয়াইট ফ্যাং-এর ক্ষুরধার দাঁত চেপে বসলো তার গলায়। মহাধমনীটা কেটে যাওয়ায় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো লিপ-লিপ। ওর মাথার কাছে পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে সেই ছটফটানিটা উপভোগ করলো হোয়াইট ফ্যাং। তারপর চলে গেলো খুশিমনে।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই ম্যাকেঞ্জি নদীর ধারে একটা গ্রাম দেখতে পেলো হোয়াইট ফ্যাং। গ্রামটা তার পরিচিত। একটা তাঁবুর কাছে যেতেই ভেতর থেকে ভেসে এলো মহিলাকণ্ঠের চিৎকার। সে জানে, অভুক্ত পেটে অতো জোরে চেঁচানো যায় না। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাজা মাছের সুগন্ধ। গ্রে বীভারের তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। গ্রে বীভার নেই; কিন্তু তাকে দেখার সাথেসাথে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো কু-কুচ। তারপর আস্ত একখানা মাছই বাড়িয়ে দিলো সামনে। মাছটা চেটেপুটে খেয়ে গা এলিয়ে দিলো হোয়াইট ফ্যাং, অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো প্রভুর পথ চেয়ে।

পনেরো

ঘরের শত্রু

কুকুরদের সাথে থাকতে থাকতে ওদের মতোই হয়ে ওঠার যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা হোয়াইট ফ্যাং-এর ছিলো, সে সম্ভাবনাটুকুও উবে গেলো তার দলপতি হবার সাথেসাথে। এমনিতেই কুকুরগুলো ঘৃণা করতো তাকে, এবার সে-ঘৃণা দ্বিগুণ হয়ে গেলো।

ঘৃণা বেড়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এরও। গত তিন বছর ধরে যে কুকুরগুলো ভয়ে পারতপক্ষে তার কাছ ঘেঁষেনি, সারাদিন তাদেরই তাড়া খাবার চেয়ে যন্ত্রণাকর বুঝি আর কিছু নেই। তবু বর্তমানে এটাই তার জীবন। হয় এ-জীবনকে মেনে নিতে হবে, নয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। এবং ধ্বংস হবার কোনোরকম ইচ্ছে তার নেই।

মিট-শা আদেশ দেবার সাথেসাথে হিংস্র গর্জন ছেড়ে সবগুলো কুকুর ঝাঁপ দেয় হোয়াইট ফ্যাংকে লক্ষ্য করে। এদের রুখে দাঁড়াবার কোনো উপায় নেই। পেছন ফেরামাত্র মুখের ওপর এসে পড়বে মিট-শার চাবুক। তাই মনের ক্রোধ দমন করে ছুটে চলে হোয়াইট ফ্যাং।

প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে হয় কুকুরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, কিন্তু

ঈশ্বরের তা ইচ্ছে নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটানোর জন্যে রয়েছে বল্গাহরিণের নাড়ির তৈরি তিরিশ ফুট লম্বা চাবুক।

একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট ফ্যাং যেন ঘরের শত্রু। তাছাড়া ইতঃপূর্বে যারা দলপতি হয়েছে, তাদের সাথে আচরণের কোনো মিল নেই তার। সারাদিন স্লেজ টানার পর যখন লাগাম খুলে নেয়া হয়, নিরাপত্তার জন্যে সে ঘুরঘুর করে না প্রভুদের কাছে। এ-ধরনের নিরাপত্তাকে ঘৃণা করে সে। বরং দিনে কুকুরগুলো তার ওপর যে অত্যাচার করে, রাতে সুদে-আসলে তা পুষিয়ে নেয় হোয়াইট ফ্যাং।

মিট-শা থামতে বলার সাথেসাথে থেমে যায় সে। অন্য কুকুরগুলো তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর, কিন্তু সাথেসাথে সপাং করে এসে পড়ে নির্দয় চাবুক। ফলে কুকুরগুলো বুঝে গেছে, থামার পর ঘাঁটানো চলবে না হোয়াইট ফ্যাংকে। অথচ নিজে ইচ্ছে করে যখন থেমে দাঁড়ায় হোয়াইট ফ্যাং, নিশ্চুপ হয়ে থাকে মিট-শার চাবুক, আর একের পর এক কুকুর কামড়ে যায় তাকে। ফলে সে-ও বুঝে গেছে, মিট-শার আদেশ ছাড়া থামা চলবে না। নতুন এসব নিয়ম শিখে নিতে হচ্ছে হোয়াইট ফ্যাংকে। শিখে নিতে হচ্ছে টিকে থাকার তাগিদে।

স্লেজ টানার সময় কুকুরগুলো হোয়াইট ফ্যাংকে কিছু না বললেও তাঁবুতে এসে আর ছেড়ে কথা কয় না। একই জাতের হলেও হোয়াইট ফ্যাং-এর মাঝে একটা পার্থক্য খুঁজে পায় তারা। অবশ্য তারাও সবাই গৃহপালিত নেকড়ে। কিন্তু সেটা যেন কোন্ সুদূরকালের ব্যাপার। বনের কথা তাদের আর মনেই পড়ে না। বন এখন তাদের কাছে ভীতিকর। অথচ হোয়াইট ফ্যাং-এর আচরণে ওত পেতে আছে সেই

বনেরই ছায়া।

সবসময় দলবদ্ধ হয়ে থাকে তারা। জানে, একা একা হোয়াইট ফ্যাং-এর সাথে পেরে ওঠা যাবে না। এই সাবধানতার জন্যে একটা কুকুরকেও খতম করতে পারে না হোয়াইট ফ্যাং। বড়োজোর কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, কিন্তু গলায় মোক্ষম কামড়টা বসাবার আগেই ছুটে আসে পুরো দল। নিজেদের মধ্যে যখন-তখন ঝগড়া করে কুকুর-গুলো, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর বিরুদ্ধে লড়ার প্রয়োজনে ভুলে যায় সব।

তবে দু'একটা কামড় দেয়া পর্যন্তই কুকুরগুলোর দৌড়। হোয়াইট ফ্যাংকে খতম করা, এমনকি তাকে উল্টে ফেলে দেয়ার সাধ্যও কোনো কুকুরের নেই।

এই নিদ্বেষ, শক্তির সার্বক্ষণিক প্রতিযোগিতা হোয়াইট ফ্যাংকে পরিণত করেছে ঘরের শত্রুতে। নিজের জাতের বিরুদ্ধেই লড়াই ঘোষণা করে বসে আছে সে। হোয়াইট ফ্যাং হিংস্র। এই হিংস্রতাই তাকে টিকিয়ে রেখেছে একদল শত্রুর বিরুদ্ধে। তার প্রভু গ্রে বীভারও হিংস্র, কিন্তু সে-ও হোয়াইট ফ্যাং-এর হিংস্রতা দেখে মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

হোয়াইট ফ্যাং-এর বয়স যখন পাঁচ, তখন আরেকটা দীর্ঘ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লো গ্রে বীভার। ম্যাকেঞ্জি নদীর তীর ধরে এগিয়ে পরকু-পাইন হয়ে সে যাবে ইউকনে। ইতোমধ্যে আরো অনেক বড়ো হয়ে গেছে হোয়াইট ফ্যাং, আরো হিংস্র। কোনো কুকুরকেই সে আর তোয়াক্কা করে না।

লড়াইয়ে নামলে সময় নষ্ট করে না সে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার অর্থই হলো শত্রুকে এক মুহূর্ত সময় বেশি দেয়া। অথচ পা শক্ত করে,

লোম ফুলিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে কুকুরগুলো। তাই তো প্রতিপক্ষ হিসেবে অযোগ্য তারা।

কারো সাথে বেশিক্ষণ গা ঠেকিয়ে রাখার মধ্যেই যে বিপদ আছে, এ-কথা হোয়াইট ফ্যাং শৈশব থেকেই জানে। তাই আঘাত হানা আর সরে আসার কাজটা সে এতো দ্রুত করে যে কুকুরগুলোর দাঁত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য হঠাৎ কোনো দাঁত যে তার শরীরের গভীরে বসে যায় না, তা নয়। কিন্তু সেটা নেহাতই দুর্ঘটনামাত্র।

সময় আর দূরত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ট ধারণা আছে তার। অবশ্য এসব ধারণা সে সচেতনভাবে করতে পারে না। চোখ ঠিকমতো দেখে, আর স্নায়ু সে-নির্দেশ পৌঁছে দেয় মগজে। চোখ মাংসপেশি আর মগজের বিচারেও সে কুকুরদের চেয়ে উন্নত। তবে এর পেছনে তার কোনো হাত নেই। আর দশটা জানোয়ারের তুলনায় প্রকৃতি তার প্রতি বেশি সদয়, এই যা।

১৮৯৮ সালের গ্রীষ্মে গ্রে বীভার পৌঁছুলো ফোর্ট ইউকনে। রকি পর্বতমালার পশ্চিমাঞ্চলে শিকার করেই সে কাটিয়ে দিলো পুরো বসন্ত-কাল। তারপর পরকুপাইনের বরফ গলে গেলে ক্যানু বেয়ে এলো ইউ-কনে। হাডসন বে কোম্পানির একটা দুর্গ আছে এখানে; আর আছে প্রচুর ইণ্ডিয়ান, অফুরন্ত হৈচৈ। সোনার লোভে ছুটে এসেছে দলে দলে মানুষ। ইউকন হয়ে তারা চলে যাবে ডসন আর ক্লনডাইকের দিকে। এক বছরেরও আগে রওনা দিয়েছে তারা, এখনো যেতে হবে শত শত মাইল। পাঁচ হাজার মাইলের কম দূর থেকে একজনও আসেনি, আর কেউ কেউ এসেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে।

সোনার খবরটা গ্রে বীভারও পেয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু টাকা হাতে

না থাকলে তো অতোদূরে রওনা দেয়া যাবে না। তাই সাথে করে সে নিয়ে এসেছে কয়েক বস্তা পশম, এবং এক বস্তা দস্তানা আর হরিণের চামড়ার জুতো। বড়োজোর দ্বিগুণ লাভের আশা ছিলো তার, কিন্তু লাভ হলো দশগুণ। আর জাত ইণ্ডিয়ানের মতোই সে বিক্রি শুরু করলো রয়েসয়ে। সব জিনিস শেষ হতে হতে যদি আগামী শীতও পেরিয়ে যায়, আপত্তি নেই তার।

ফোর্ট ইউকনেই সর্বপ্রথম শাদা চামড়ার মানুষ দেখলো হোয়াইট ফ্যাং। মনে হলো, আগের ঈশ্বরগুলোর চেয়ে এই ঈশ্বরগুলো যেন বেশি শক্তিশালী। শৈশবে যেমন তাঁবুই ছিলো তার কাছে শক্তির অন্যতম প্রতীক, তেমনি এখন তার কাছে শক্তির প্রতীক হলো বাড়ি আর বড়ো বড়ো কাঠের দুর্গ। এসব নিশ্চয় শাদা ঈশ্বরেরা তৈরি করেছে। সুতরাং ঈশ্বর হিসেবে তারা অধিকতর শক্তিশালী। সত্যি বলতে কি, তারা মহাশক্তিশালী। এমনকি গ্রে বীভারও তাদের তুলনায় শিশু-ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে প্রথমে এই ঈশ্বরগুলোকে সে সন্দেহের চোখেই দেখলো। নতুন যে-কোনো জিনিসই সন্দেহজনক। কয়েক ঘণ্টা ধরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শাদা ঈশ্বরগুলোর ওপর নজর রাখলো সে। তারপর যখন দেখলো একটা কুকুরেরও কোনো ক্ষতি হলো না, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

ঈশ্বরগুলোও যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করলো তার ব্যাপারে। আসলে তার নেকড়ের মতো চেহারা আকৃষ্ট করেছিলো সবাইকে। ফিসফিস করতে করতে হাত ইশারা করলো তারা। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। তাই ঈশ্বরগুলো আরো এগিয়ে আসতেই বের করলো দাঁত। সুখের বিষয়, এই উগ্রমূর্তি দেখে কেউ

আর তার গায়ে হাত দেয়ার সাহস পেলো না।

কয়েক দিনের মধ্যেই হোয়াইট ফ্যাং বুঝতে পারলো, জনা যাদের শাদা ঈশ্বর এখানে থাকে। দু'তিন দিন পরপর একটা জাহাজ আসে। অসংখ্য শাদা ঈশ্বর নামে জাহাজ থেকে, কিন্তু আবার ফিরে যায় সেই জাহাজেই। তারা যে কোত্থেকে আসে, যায়ই বা কোথায়, কিছুই বুঝতে পারে না হোয়াইট ফ্যাং।

কিন্তু শাদা ঈশ্বরেরা যেমন মহাশক্তিশালী, তাদের কুকুরগুলো আবার সেই পরিমাণেই দুর্বল। তাদের চেহারারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনোটার পা ছোটোছোটো—খুবই ছোট; আবার কোনো-টার পা বড়োবড়ো—খুবই বড়ো। চুল আছে প্রত্যেকের, কিন্তু লোম নেই একটারও। সে-চুলও কারো কারো আবার একেবারেই ছোট্ট। আর লড়াই কীভাবে করতে হয়, এক ব্যাটাও জানে না।

শুধু শক্তির ওপরেই নির্ভর করে থাকে তারা, ধার ধারে না কৌশ-লের। ফলে হোয়াইট ফ্যাং-এর কাঁধের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে মাটিতে, আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই কট্ করে কেটে যায় গলার মোটা রগটা।

মোক্ষম কামড় খাওয়া কুকুরটা যখন ধুলোর মাঝে ছটফট করে মৃত্যুযন্ত্রণায়, ইণ্ডিয়ানদের কুকুরগুলো তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে একযোগে। টুকরো টুকরো করে ফেলে চোখের পলকে। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং তখন আশেপাশে নেই। শত্রুকে শেষ করতে পারলেই সে খুশি, আর কিছুর দরকার নেই তার। তাছাড়া একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে হোয়াইট ফ্যাং। সে আগে লক্ষ্য করেছে, নিজেদের কুকুর মারা পড়লে খুব রেগে যায় কালো ঈশ্বরেরা। কথা হলো, যে কারণে কালো ঈশ্ব-রেরা রাগ করে, ওই একই কারণে শাদা ঈশ্বরেরাও রাগ করবে—

এটাই স্বাভাবিক। তাই দূরে সরে থাকে হোয়াইট ফ্যাং। ফলে যা হবার, তা-ই হয়। অপকর্ম করে সে, আর গদার বাড়ি, কুড়োলের ঘা খায় ইণ্ডিয়ানদের কুকুরগুলো।

একদিন ঘটলো ভয়াবহ এক ঘটনা। জাহাজ এসে থামার পরপরই একটা সেটারকে খতম করে কেটে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়লো ইণ্ডিয়ানদের কুকুর। সেটারটার মালিক—শাদা একজন ঈশ্বর দাঁড়িয়েছিলো পাশেই। চোখের সামনে প্রিয় কুকুরের এই দশা দেখে আর স্থির থাকতে পারলো না সে। মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে গুলি করলো পরপর ছ'বার। চোখের পলকে গড়িয়ে পড়লো ছ'টা কুকুর। কয়েকটা মারা গেলো তখনই, কাতরাতে লাগলো মুমূর্ষুগুলো।

ঘটনাটা ভয়াবহ, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর জন্যে নয়। সে বরং উপভোগই করলো পুরো ব্যাপারটা। ছ'-ছ'টা মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু সবগুলোই শত্রু—ভালোই তো। প্রথম প্রথম শাদা ঈশ্বরের কুকুরগুলোকে মারলো সে স্রেফ মজা পাবার জন্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে এটা তার নেশা হয়ে দাঁড়ালো। কিছু করার নেই। ওদিকে গ্রে বীভার তার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং হোয়াইট ফ্যাং দাঁড়িয়ে থাকে জাহাজ আসার অপেক্ষায়, সাথে থাকে কুখ্যাত সেই কুকুরের দল। জাহাজ আসার সাথেসাথে শুরু হয়ে যায় খেলা, জাহাজ চলে গেলে বন্ধ। তখন অপেক্ষা করে থাকে পরবর্তী জাহাজের জন্যে।

কুকুরগুলোর সাথে সে কাজ করে সত্যি, কিন্তু ভুলেও কখনো মেশে না। শাদা ঈশ্বরদের কুকুরকে ফেলে দেয়ার দায়িত্ব নেয় সে, কিন্তু শাস্তি গ্রহণের ভার ছেড়ে দেয় দলের কুকুরদের ওপর।

তবে কাজটা করার জন্যে এমন কিছু খাটতে হয় না তাকে। বিদেশী

কুকুরগুলোকে উত্তেজিত করার জন্যে তার চেহারাই যথেষ্ট। তাকে দেখামাত্র শুরু হয়ে যায় তাদের লাফালাফি। সভ্য আর বুনোর সেই চিরাচরিত দ্বন্দ্ব। তারা সভ্য কুকুর, বন তাদের কাছে আতঙ্ক আর ধ্বংসের প্রতীক। এবং বুনো জিনিসকে খতম করার পূর্ণ অধিকার তাদের প্রভুরা তাদের দিয়েই রেখেছে।

জাহাজ থেকে ইউকনের তীরে নামার সাথেসাথে একেবারে সামনে তারা দেখতে পায় হোয়াইট ফ্যাংকে। বুনো শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যে নেচে ওঠে তাদের রক্ত। শুধু নিজের চোখ দিয়েই তারা সেসময় দেখে না, তাদের চোখে মিলিত হয় পূর্বপুরুষদের দৃষ্টি। তাই শহুরে লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও বুনো শত্রুকে মুহূর্তের মধ্যে চিনে নেয়ার জন্য-তাটা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে।

তবে হোয়াইট ফ্যাং পুরো ব্যাপারটাই উপভোগ করে। বিদেশী কুকুরগুলোর রাগ তার চিন্তার কারণ ঘটায় না, বরং তাদের নিজের জন্যেই ডেকে আনে সমূহ বিপদ। তাছাড়া, তাকে হত্যা করার অধিকার যদি বিদেশী কুকুরগুলোর থেকে থাকে, তাহলে তাদেরও হত্যা করার রয়েছে তার সমান অধিকার।

একেবারে শৈশবেই তাকে লড়তে হয়েছে টারমিজান, বেজি, লিংক্স, লিপ-লিপ আর তার দলের খুদে কুকুরগুলোর সাথে। যদি এদের মুখোমুখি না হতে হতো, যদি ভালোবাসায় তাকে ভাসিয়ে দিতো গ্রে বীভার, তাহলে একদিন না একদিন সে হয়ে উঠতো অবিকল কুকুরদের মতোই। কিন্তু এসবের কোনোটাই ঘটেনি হোয়াইট ফ্যাং-এর জীবনে, তাই সে-ও কখনো কুকুর হয়ে ওঠেনি। হয়েছে যা হবার তা-ই—বদ-মেজাজী, নিঃসঙ্গ, প্রেমহীন আর হিংস্র।

ষোলো

উন্মাদ ঈশ্বর

ফোর্ট ইউকনে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গ মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তাদের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয় এবং বহিরাগত কোনো মানুষকে তারা সহ্য করতে পারে না।

আগন্তুকেরা ঝামেলায় পড়লে খুব খুশি হয় তারা। তাই হোয়াইট ফ্যাং আর তার দলের হাতে আগন্তুকদের কুকুর মারা পড়তে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

বিশেষ করে একটা লোক খুবই আনন্দ পায় এই খেলায়। জাহাজের বাঁশি শোনার সাথেসাথে এসে হাজির হয় সে, সমস্ত শেষ হয়ে যাবার পর ফিরে যায় ম্লানমুখে। যখন কোনো কুকুর মাটিতে পড়ে গোঙাতে শুরু করে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় সে, চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। কিন্তু সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে হোয়াইট ফ্যাংকে দেখে সে লোলুপ দৃষ্টিতে।

লোকটাকে সবাই ডাকে বিউটি স্মিথ বলে। নাম নিয়ে এতোবড়ো পরিহাস বুঝি আর হয় না। কারণ তার চেহারায় আর যা-ই থাক,

সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই। ছোট্ট একটা শরীর, তার ওপরে ততোধিক ছোট্ট একটা মাথা। খুলির সামনের দিকটা এতোই ছোট যে, শৈশবে সবাই তাকে ডাকতো 'পিনহেড' বলে।

খুলির পেছনদিকটা ঢালু হয়ে মিশে গেছে ঘাড়ের সাথে। কপালটা অত্যন্ত চওড়া, চোখদু'টোও বড়ো বড়ো। চোয়ালদু'টো ঝুলে নেমে এসেছে প্রায় বুকের ওপর।

এরকম চোয়াল সাধারণত হিংস্রতা নির্দেশ করে। সে কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টো। তার মতো পাজি আর কাপুরুষ এই অঞ্চলে আর নেই। হলদে হলদে দাঁতগুলোও বেশ বড়ো, বিশেষ করে দু'টো দাঁত বেরিয়ে এসেছে ঠোঁটের একেবারে বাইরে।

এককথায় বিউটি স্মিথকে কুৎসিতদর্শন একটা দানবই বলা যায়। দুর্গের লোকদের রান্নাবান্না করে সে, থালাবাসন মেজে দেয়। সবাই ঘৃণা করে তাকে, কিন্তু সে ঘৃণার সাথে মিশে আছে এক ধরনের ভয়। সবাই জানে, প্রয়োজনে পেছনদিক থেকে গুলি করতে কিংবা কফির পেয়ালায় বিষ মিশিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না বিউটি স্মিথ। তবে আর কিছু না পারুক, রান্নার কাজটা ভালোই পারে সে।

মনে মনে হোয়াইট ফ্যাংকে পাবার একটা আশা পোষণ করে বিউটি স্মিথ। কিন্তু কাছে যাবার সাথেসাথে থেঁকিয়ে ওঠে হোয়াইট ফ্যাং। প্রথম থেকেই কেন যেন তার মনে হয়েছে, লোকটা অশুভ।

এসব ব্যাপারে অবশ্য অতো চিন্তার ধার ধারে না জানোয়ারেরা। যা বোঝার, সোজাসুজি বোঝে। যেমন সোজাসুজিই হোয়াইট ফ্যাং বুঝেছে, বিউটি স্মিথ লোকটা সুবিধের নয়।

বিউটি স্মিথ যেদিন প্রথম গ্রে বীভারের সাথে দেখা করতে আসে, হোয়াইট ফ্যাং তখন তাঁবুতেই ছিলো। দূর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে

আসার সাথেসাথে সে বুঝতে পারলো, কে আসছে। তাই উঠে চলে গেলো তাঁবুর এক প্রান্তে। বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো দু'জনের, যার একটা বর্ণও শুনতে পেলো না হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু বিউটি স্মিথ তার দিকে একবার হাত তুলতেই গর্জে উঠলো সে। তারপর চলে গেলো পাশের বনে।

কুকুরটাকে বিক্রি করতে রাজি হলো না গ্রে বীভার। ব্যবসা করে ইতোমধ্যেই হাতে যথেষ্ট টাকা এসেছে তার। তাছাড়া স্লেজ টানার কাজে ওটার চেয়ে ভালো কুকুর আজ পর্যন্ত তার নজরে পড়েনি। এমনকি দলপতি হিসেবেও ওটার তুলনা নেই। সত্যি বলতে কি, ম্যাকেঞ্জির আশপাশ থেকে শুরু করে ইউকন পর্যন্ত হোয়াইট ফ্যাং-এর সমকক্ষ একটা কুকুরও নেই। মানুষের মশা মারার মতোই অনায়াসে সে খতম করে দিতে পারে যে কোনো কুকুরকে। গল্প শুনতে শুনতে চোখ চকচক করে উঠলো বিউটি স্মিথের, ঠোঁট চাটলো সে। কিন্তু না। হোয়াইট ফ্যাংকে কিছুতেই বিক্রি করবে না গ্রে বীভার।

কিন্তু বিউটি স্মিথ ইণ্ডিয়ানদের খুব ভালো করেই চেনে। তাই এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন একটা কিংবা দু'টো বোতল হাতে নিয়ে সে হাজির হতে লাগলো গ্রে বীভারের তাঁবুতে। দেখতে দেখতে তরল ওই আগুনের নেশায় পাগল হয়ে উঠলো গ্রে বীভার। ব্যবসার লাভের টাকা খরচ হতে লাগলো হু হু করে। আর টাকা যা কমে এলো, ততোই চড়ে গেলো গ্রে বীভারের মেজাজ।

অবশেষে সর্বস্ব খুইয়ে বসলো গ্রে বীভার, রয়ে গেলো শুধু নেশা। সুযোগ বুঝে কথাটা আবার পাড়লো বিউটি স্মিথ। তবে এবারে সে হোয়াইট ফ্যাং-এর মূল্য পরিশোধ করতে চাইলো হুইস্কির বোতল দিয়ে। আর টাকার চেয়ে গ্রে বীভারের আগ্রহ এখন বোতলের দিকেই

বেশি।

'ধরে নিয়ে যাও না ওটাকে, কে মানা করেছে,' ঢুলতে ঢুলতে শেষমেশ বললো গ্রে বীভার।

বোতলগুলো বিউটি স্মিথ দিলো দু'দিন পর। বললো, 'কুকুর তুমিই ধরে দাও না বাপু!'

ব্যাপারটা পুরোপুরি না বুঝলেও হোয়াইট ফ্যাং এটুকু বুঝতে পেরেছিলো যে, একটা বিপদ হতে যাচ্ছে তার। ইদানীং বেশির ভাগ সময়ই তাই সে থাকতো বাইরে বাইরে।

একদিন তাঁবুতে ফিরে শাদা ঈশ্বরটাকে দেখতে না পেয়ে হাঁপ ছাড়লো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু শুয়ে পড়তে না পড়তেই বোতল হাতে নিয়ে টলতে টলতে এসে হাজির হলো গ্রে বীভার। একটা চামড়ার বকলস্ পরিয়ে দিলো গলায়, তারপর মদ খেতে লাগলো ঢক্‌ঢক্ করে।

ঘণ্টাখানেক পর পরিচিত সেই পদশব্দ কানে আসতেই কান খাড়া হয়ে গেলো তার, কিন্তু গ্রে বীভার তখনো ঢুলছে। ছাড়া পাবার জন্যে একটু টানাটানি করলো হোয়াইট ফ্যাং, জবাবে আরো শক্ত হয়ে চেপে বসলো গ্রে বীভারের আঙুল।

বিউটি স্মিথ তাঁবুতে ঢুকতেই মৃদু গর্জন করে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। তারপর শয়তানটার হাত মাথার ওপর নেমে আসতেই লাফ দিলো সে। বিদ্যুদ্‌বেগে হাত টেনে নিলো বিউটি স্মিথ, অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর কামড়। প্রায় সাথেসাথেই মাথার পাশে এসে পড়লো গ্রে বীভারে ঘুসি, চুপ হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

তাঁবুর বাইরে চলে গেলো বিউটি স্মিথ, একটু পরেই ফিরে এলো একটা গদা নিয়ে। হোয়াইট ফ্যাং-এর দড়িটা বিউটি স্মিথের হাতে তুলে দিলো গ্রে বীভার, কিন্তু যেতে চাইলো না সে। তখন ইচ্ছেমতো গদাপেটা করতে লাগলো বিউটি স্মিথ। বাধ্য হয়ে রওনা দিলো

সে, কিন্তু দু'এক পা যাবার পরই ঝাঁপ দিলো বিউটি স্মিথের টুঁটি লক্ষ্য করে। গদার প্রচণ্ড আঘাত তাকে থামিয়ে দিলো মাঝপথেই। সম্মতির হাসি হেসে মাথা ঝাঁকালো গ্রে বীভার।

দ্বিতীয় আর কোনো চেষ্টা করলো না হোয়াইট ফ্যাং। কারণ গদা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা ভালোই জানা আছে শাদা ঈশ্বরটার।

দুর্গে পৌঁছার পর তাকে ভালোভাবে বেঁধে রেখে শুতে গেলো বিউটি স্মিথ। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলো সে। তারপর বাঁধনটা দু'টুকরো করে ফেললো চোখের পলকে। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে রওনা দিলো হোয়াইট ফ্যাং। ভয়ঙ্কর এই ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই তার। নিজেকে সে সমর্পণ করে দিয়েছে গ্রে বীভারের কাছে।

কিন্তু পরদিন সকালে আবার ঘটলো সেই একই ঘটনা। পার্থক্যের এটুকুই, এবারে গ্রে বীভার নিজেই তাকে নিয়ে চললো বিউটি স্মিথের আস্তানায়। শক্ত করে বেঁধে মারতে শুরু করলো বিউটি স্মিথ। এমন মার যা হোয়াইট ফ্যাং জীবনে কখনো ভুলবে না।

হোয়াইট ফ্যাংকে মারার ব্যাপারটা অত্যন্ত উপভোগ করলো বিউটি স্মিথ। অবোধ কুকুরটার প্রত্যেকটা চিৎকার, প্রত্যেকটা গোঙানি তার ভেতরে ছড়িয়ে দিলো উল্লাস। বিউটি স্মিথ নিষ্ঠুর, কাপুরুষেরা ঠিক যেমন নিষ্ঠুর হয়। এতোদিন পর্যন্ত তার সাথে যে দুর্ব্যবহার করে এসেছে সবাই, তারই প্রতিশোধ যেন সে তুলছে এই কুকুরটার ওপর। পৃথিবীর সবাই হতে চায় শক্তির অধিকারী, বিউটি স্মিথও তার ব্যতিক্রম নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, মানুষের ওপর শক্তি ফলাবার ক্ষমতা তার নেই। তাই অক্ষমতার সেই ঘা। সে ভুলতে চাইছে হোয়াইট ফ্যাংকে পিটিয়ে।

তবে পিটুনি কেন খেতে হলো, । পরিষ্কার বুঝতে পারলো হোয়া

ইট-ফ্যাং। গ্রে বীভার চাইছিলো, সে বিউটি স্মিথের কাছেই থাক: ওদিকে বিউটি স্মিথ চাইছিলো, সে যেন আর গ্রে বীভারের কাছে ফিরে না যায়। অর্থাৎ দুই ঈশ্বরকেই অমান্য করেছে সে। ইতঃপূর্বে এক প্রভুর কাছ থেকে আরেক প্রভুর কাছে কুকুরদের চলে যেতে দেখেছে হোয়াইট ফ্যাং। সেসব ক্ষেত্রেও যে কুকুরেরা ফিরে আসতে চাইতো, প্রচণ্ড মার খেতে হতো তাদের। কিন্তু গ্রে বীভারের কথা যে ভোলা যাচ্ছে না। যাবতীয় বদমেজাজ আর হিংস্রতার মাঝেও বিশ্বস্ততার ব্যাপারটা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না সে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে গ্রে বীভার তার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। এতো উপকারে আসার পরেও তাকে পরিত্যাগ করা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং তাতে কিছুই মনে করেনি। গ্রে বীভারকে ভালোবাসে না সে, তবু কোথায় একটা বন্ধন যেন আছে, যে বন্ধন সহজে ছেঁড়া যায় না।

রাতে আবার বাঁধন খোলার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু এবারে খুঁটির সাথে বাঁধা থাকার কাজটা সহজ হলো না। তবু অসীম ধৈর্যসহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিবোতে চিবোতে শেষ পর্যন্ত খুঁটিটা ভেঙে ফেললো সে। তারপর ভোরের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে চললো প্রভুর তাঁবুর দিকে।

যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু সে-বুদ্ধির সাথে যদি বিশ্বস্ততার যোগ না থাকতো, তাহলে ইতোমধ্যেই যে লোকটা তার সাথে দু'দু'বার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিছুতেই তার কাছে ফিরে আসতো না সে। স্রেফ বিশ্বস্ততা তাকে এখানে টেনে আনলো। তৃতীয়বারের মতো প্রতারিত হতে। তাঁবুতে ঢোকার সাথেসাথে মধ্যরাতি তাকে বেঁধে ফেললো গ্রে বীভার। সকালে নিতে এলো বিউটি স্মিথ। আর

যে মার হলো, সেটা গতকালের চেয়েও মারাত্মক।

চাবুকপেটা করার পুরো সময়টা গ্রে বীভার শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। কিছু বলার নেই। হোয়াইট ফ্যাং এখন আর তার কুকুর নয়। দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কুকুর হলে হয়তো মরেই যেতো এতোক্ষণে, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর জীবন বড়ো কঠিন। তবে মারা না গেলেও মরার মতোই সে পড়ে রইলো আধঘণ্টা ধরে। তারপর উঠে অন্ধের মতো টলতে টলতে নিউটি স্মিথের পিছুপিছু রওনা দিলো দুর্গ অভিমুখে।

এবার তাকে বাঁধা হলো লোহার শেকল দিয়ে। সুতরাং কাটার আর কোনো সম্ভাবনাই রইলো না। কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থায় গ্রে বীভার ফিরে গেলো ম্যাকেঞ্জির দিকে। আর হোয়াইট ফ্যাং রয়ে গেলো ইউকনে, আধা উন্মাদ অথচ পুরো শয়তান এক ঈশ্বরের সম্পত্তি হয়ে। অবশ্য উন্মাদ কাকে বলে, হোয়াইট ফ্যাং তা জানে না। শুধু জানে, এখন থেকে মেনে চলতে হবে এই নতুন প্রভুটিকেই, নিজেকে সঁপে দিতে হবে তার যাবতীয় বাতিক আর নিষ্ঠুরতার কাছে।

সতেরো

ঘৃণার শাসন

উন্মাদ ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে থাকতে থাকতে হোয়াইট ফ্যাংও হয়ে উঠলো প্রায় উন্মাদের মতোই। দুর্গের পেছনদিকে একটা খোঁয়াড়ে তাকে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে বিউটি স্মিথ, আর নানারকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তোলে। হাসলে যে হোয়াইট ফ্যাং রেগে যায়, এটাও খেয়াল করেছে সে। তাই যখন-তখন খোঁয়াড়ের পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি দিয়ে ওঠে সে, একইসাথে আঙুল নির্দেশ করে হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। রাগে সমস্ত বোধ বুঝি লোপ পেয়ে যায় তার। অন্তত তখন যেন হোয়াইট ফ্যাং পরিণত হয় বিউটি স্মিথের চেয়েও ঘোরতর উন্মাদে।

আগে সে শুধু ছিলো নিজের জাতের শত্রু, কিন্তু এখন সে পরিণত হয়েছে সবার শত্রুতে। পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসের প্রতি রাশি রাশি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তার। যে লোহার শেকলটা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেই শেকলটাকে ঘৃণা করে সে। ঘৃণা করে খোঁয়াড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়া কিশুলোকে। ঘৃণা করে লোক-

গুলোর সাথে আসা কুকুরদের, তার অসহায় অবস্থা দেখে যারা দাঁত বের করে। এমনকি খোঁয়াড়ের কাঠগুলোকে পর্যন্ত ঘৃণা করে সে। তবে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে বিউটি স্মিথকে।

তবে হোয়াইট ফ্যাংকে এভাবে উন্মাদ করে তোলার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিলো বিউটি স্মিথের। একদিন হঠাৎ একটা গদা হাতে করে খোঁয়াড়ের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে, হোয়াইট ফ্যাং-এর গলার শেকলটা খুলে দিয়েই আবার বেরিয়ে এলো বাইরে। ছাড়া পেয়ে খোঁয়াড়ের চারপাশে ছুটে বেড়াতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং, যেন বের হতে পারলে দেখে নিতো জমায়েত হওয়া ওই লোকগুলোকে। প্রকাণ্ড শরীর হয়েছে এখন হোয়াইট ফ্যাং-এর। সমবয়সী নেকড়েদের চেয়েও বেশ খানিকটা বড়ো। লম্বায় পাঁচ ফুট, উচ্চতা আড়াই ফুট, ওজন নব্বই পাউণ্ডের ওপরে। এক বিন্দু বাড়তি মাংস নেই কোথাও, যেন এই শরীর তৈরিই হয়েছে লড়াই করার জন্যে।

আবার খুলে গেলো খোঁয়াড়ের দরজা। থমকে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে। দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকলো এক বিশালদেহী ম্যাস্টিফ। এমন কুকুর সে আগে কখনো দেখেনি। তবু কুকুর তো বটে! এতোদিনে প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ পেলো সে। ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং, চোখের পলকে ফাঁক হয়ে গেলো ম্যাস্টিফটার ঘাড়ের একটা পাশ। মাথা ঝাঁকিয়ে, কর্কশ গর্জন ছেড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাস্টিফ। আবার ঝাঁপ দিলো সে। আবার। কিন্তু একবারও ছুঁতে পারলো না প্রতিপক্ষকে। সারা খোঁয়াড় জুড়ে হোয়াইট ফ্যাং যেন চমকে বেড়াচ্ছে বিদ্যুতের মতো।

বাইরে থেকে চিৎকার করতে লাগলো দর্শকেরা। ফ্ল-

হারা হয়ে উঠলো বিউটি স্মিথ। জেতার কোনো আশা নেই ম্যাক্সিফটার। অত্যন্ত ভারী সে, অত্যন্ত মন্থর। শেষমেষ গদার বাড়ি মেরে হোয়াইট ফ্যাংকে পিছু হটতে বাধ্য করলো বিউটি স্মিথ, ম্যাক্সিফটাকে টেনে নিয়ে গেলো তার মালিক। তারপর বিউটি স্মিথের হাতের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠলো বাজি জেতার টাকা।

এই ঘটনার পর থেকে খোঁয়াড়ের বাইরে লোকের ভিড় দেখলেই হোয়াইট ফ্যাং বুঝতে পারে, লড়াই হবে আজ। তার প্রভুও ভালো করেই জানে, লড়াই শুরু করতে হবে কখন। লড়াইয়ে হোয়াইট ফ্যাংই জেতে সবসময়। তবে স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা আহত হয় সে, ছ'-চারটে ক্ষত সৃষ্টি হয় শরীরে। আর সেই ক্ষতগুলো সেরে উঠলেই নতুন লড়াইয়ের আয়োজন করে বিউটি স্মিথ। একদিন হোয়াইট ফ্যাংকে লড়তে হলো পরপর তিনটে কুকুরের সাথে। আরেকদিন বন থেকে সদ্য ধরে আনা একটা নেকড়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো খোঁয়াড়ে। একদিন এমনকি একইসাথে ছ'টো কুকুরের বিরুদ্ধে লড়তে হলো তাকে। শেষমেষ ছ'টোকেই সে খতম করলো বটে, কিন্তু নিজেও হয়ে গেলো আধমরা।

শরৎকালে হোয়াইট ফ্যাংকে নিয়ে জাহাজে করে ডসনের দিকে রওনা দিলো বিউটি স্মিথ। ইতোমধ্যে 'লড়াকু নেকড়ে' হিসেবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হোয়াইট ফ্যাং-এর নাম। ফলে তার খাঁচার চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো উৎসুক দর্শকের দল। কখনো গর্জে উঠে তাদের উদ্দেশে দাঁত বের করলো সে, কখনো চেয়ে রইলো ঠাণ্ডা চোখে। অবশ্য তীব্র ঘৃণার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললেও ঘৃণার কারণ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তার মনে কখনোই জাগেনি। বেঁচে থাকাটাই এখন তার কাছে নরক সমতুল্য। কারণ, বন্দী-জীবন কাটাবার

জন্যে যে প্রাণীর জন্ম হয়নি, তার পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা খাঁচায় আবদ্ধ থাকার চেয়ে যন্ত্রণা বুঝি আর কিছু নেই। এদিকে এই যন্ত্রণার সাথে আবার যোগ হয়েছে মানুষের অত্যাচার। স্রেফ গর্জন শোনার জন্যে তাকে খোঁচা মারে ওরা, আর গর্জে ওঠার সাথেসাথে লুটিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে।

এরকম পরিবেশেই দিন কাটতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। অপমান সইতে সইতে হিংস্রতার চরম সীমায় পৌঁছে গেলো সে। তবে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। অন্য অনেক কুকুর এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে হয় মারা যেতো, নয়তো নিঃশেষ হয়ে যেতো তেজ। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর মধ্যে সেরকম কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠেনি।

যদি বিউটি স্মিথকে শয়তানের সমতুল্য ধরা হয়, তাহলে হোয়াইট ফ্যাংও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। পরস্পরের প্রতি তারা পোষণ করে অসীম ঘৃণা। আগে গদা হাতে মানুষ দেখলেই মাথা নোয়াতো হোয়াইট ফ্যাং; কিন্তু এখন সে-আনুগত্যের আর লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। বিউটি স্মিথকে দেখার সাথেসাথে রেগে আগুন হয়ে যায় সে। এজন্যে মারও খায় যথেষ্ট, তবু দাঁত খিঁচোতে দ্বিধা করে না। গদার বাড়ি পড়তে থাকে একের পর এক, তারই সাথে পাল্লা দিয়ে গজরাতে থাকে সে। পেটাতে পেটাতে ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরে যায় বিউটি স্মিথ, তখনো পেছন থেকে ভেসে আসে হোয়াইট ফ্যাং-এর গর্জন।

জাহাজ ডসনে পৌঁছার পর তীরে নামানো হলো হোয়াইট ফ্যাংকে। কিন্তু কৌতূহলী জনতার হাত থেকে রেহাই পেলো না সে। 'লড়াকু নেকড়ে' হিসেবে প্রদর্শিত হলো হোয়াইট ফ্যাং। সবাই তাকে

দেখতে লাগলো পঞ্চাশ সেন্টের সমমানের সোনার গুঁড়ো দিয়ে। এক মুহূর্তের জন্যে বিশ্রাম পেলো না সে। অবসন্ন শরীরে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করতেই লাঠির খোঁচায় জাগিয়ে দেয়া হলো তাকে স্রেফ দর্শক-দের পয়সা উসুল করার খাতিরে।

প্রদর্শনের পাশাপাশি চললো লড়াই। কয়েক দিন করে নিয়মিত বিরতির ফাঁকে ফাঁকে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে জঙ্গলের ধারে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে কাজটা সাধারণত করা হলো রাতের বেলায়। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দিনের আলো ফোটার প্রায় সাথে-সাথেই এসে হাজির হতে লাগলো প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুর আর দর্শকের দল। এভাবে বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন জাতের কতো কুকুরের সাথে যে তাকে লড়তে হলো, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

ডসন জায়গাটা যেমন বুনো, তেমনি হিংস্র এখানকার অধিবাসীরা। লড়াইয়ে যে-কোনো একটা কুকুরের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি পায় না এরা। তবে প্রতিবারই মৃত্যু ঘটে প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরটার। কারণ পরাজয় কি জিনিস, হোয়াইট ফ্যাং জানে না। ম্যাকেঞ্জি হাউণ্ড, এস্কিমো ডগ, ল্যাব্রাডর ডগ, হাস্কি, মেলমুট—সবাই পরাজিত হলো একেএকে। অন্তত একবার হোয়াইট ফ্যাং-এর পরাজয় দেখার জন্যে ভিড় করতে লাগলো দর্শকেরা, কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরতে হলো বিফলমনো-রথ হয়ে।

অসাধারণ ক্ষিপ্রতার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস হোয়াইট ফ্যাংকে জিতিয়ে দিলো সবসময়। অভিজ্ঞতা। জীবনে যতোবার লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে সে, তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই সম্ভবত তার অর্ধেকও লড়েনি।

ধীরে ধীরে একসময় হতাশ হয়ে পড়লো দর্শকেরা, সেইসাথে কমতে লাগলো লড়াইয়ের সংখ্যা। বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে নেকড়ে লেলিয়ে দিতে লাগলো বিউটি স্মিথ। নেকড়ে হলে তবু কিছুটা দর্শক জমে। একবার একটা লিংক্সকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো তার খাঁচায়। মরিয়া হয়ে লড়লো হোয়াইট ফ্যাং। ক্ষিপ্রতা এবং হিংস্রতায় সে লিংক্সেরই সমকক্ষ, কিন্তু অস্ত্রের হিসেবে কিছুটা খাটো। তার আছে শুধুই দাঁত, আর দাঁতের পাশাপাশি লিংক্সের আছে তীক্ষ্ণ নখর।

লিংক্সটা মারা যাবার পর একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো লড়াই। সবাই বুঝে গেছে, হোয়াইট ফ্যাং-এর বিরুদ্ধে বাজি ধরে কোনো লাভ নেই। সুতরাং বেশ কিছুদিন ধরে শুধু প্রদর্শনী চললো তার। অবশেষে সেখানে এসে পৌঁছুলো টিম কীনান নামে এক জুয়াড়ী, সাথে একটা বুলডগ। এর আগে সারা ক্লনডাইক অঞ্চলে বুলডগ দেখেনি কেউ। একটা লড়াই যে আসন্ন, সে-কথা বুঝতে পারলো সবাই। তাই চারদিকে চলতে লাগলো শুধু সেই লড়াইয়েরই জল্পনাকল্পনা।

আঠারো

নাছোড় মৃত্যু

হোয়াইট ফ্যাং-এর গলা থেকে লোহার শেকলটা খুলে নিয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেলো বিউটি স্মিথ।

জীবনে এই প্রথম তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালালো না হোয়াইট ফ্যাং। কান খাড়া করে তাকিয়ে রইলো প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। এরকম কুকুর সে আগে কখনো দেখেনি। বিড়বিড় করে 'যা' বলেই টিম কীনান সামনের দিকে ঠেলে দিলো বুলডগটাকে। বেঁটে, কিম্ভূত চেহারার জানোয়ারটা হেলেদুলে এসে থামলো বৃত্তের মাঝখানে, পিটপিট করে তাকাতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে।

চিৎকার করে উঠলো দর্শকের দল। 'এগিয়ে যা, চেরোকী!' 'কয়ে দে ব্যাটাকে!' 'খেয়ে ফেল আস্ত!'

কিন্তু লড়াইয়ের কোনো আগ্রহ দেখা গেলো না চেরোকীর মধ্যে। পিটপিট করে সে এবার তাকালো দর্শকদের দিকে, সেইসাথে ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগলো খুদে লেজটা। চেহারায় ভয়ের কোনো প্রকাশ নেই, কিন্তু চালচলন কেমন যেন মন্থর। মনে হচ্ছে, সামনের ওই

কুকুরটার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এটা যেন ভাবতেও পারছে না সে। ওরকম কুকুরের সাথে সে আগে কখনো লড়েনি। তাই যেন অপেক্ষা করে আছে, কখন একটা সত্যিকারের কুকুর এসে হাজির করা হবে।

এগিয়ে এলো টিম কীনান, ঝুঁকে পড়ে আদরের ভঙ্গিতে ডলতে লাগলো কুকুরটার দুই কাঁধ। এতেই যেন যা বোঝার বুঝে গেলো বুলডগটা। চাপা গর্জন বেরোতে লাগলো তার গলা থেকে।

এতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু গম্ভীর ওই গর্জনের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো এবার। ধীরে ধীরে ঘাড় আর কাঁধের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেলো তার। চেরোকীকে সামনের দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে গেলো টিম কীনান। বাঁকা পায়ে দ্রুত এগোতে শুরু করলো চেরোকী। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আঘাত হানলো হোয়াইট ফ্যাং। বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতিতে মাঝখানের দূরত্বটুকু অতিক্রম করলো সে; দাঁত বসিয়ে দিয়েই লাফিয়ে সরে এলো পেছনে। বিস্ময়ে হৈচৈ করে উঠলো দর্শকের দল।

ঘাড়ের এক পাশ থেকে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে, কিন্তু টুঁ শব্দও করলো না বুলডগটা। শত্রুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো সে। এত কুকুরের ক্ষিপ্রতা এবং আরেক কুকুরের অবিচলিত ভাব দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলো দর্শকেরা। আসল বাজির ওপরে আবার নতুন করে বাজি ধরতে লাগলো তারা। আবার আঘাত হেনে পেছনে সরে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এবারেও পাল্টা আঘাত হানতে পারলো না তার অদ্ভুত প্রতিপক্ষ, কিন্তু বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলো না গতি। ধীরে অথচ যেন একটা স্থির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চললো বুলডগটা।

অবাক হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এরকম শত্রুর মোকাবিলা কখনোই করতে হয়নি। গায়ে বড়ো বড়ো কোনো লোম না

এর রক্ত ঝরানো খুবই সহজ। কিন্তু যতো সহজই না কোনোরকম শক্তই করে না।

প্রয়োজনে চেরোকীও যথেষ্ট ক্ষিপ্র কিন্তু সে-ক্ষিপ্রতা হোয়াইট ফ্যাং-এর কাছে হার মানছে। ফলে অবাক সে-ও কম হয়নি। এই প্রথম একটা কুকুরকে ছুঁতে পারছে না সে। কুকুরটার চালচলনও ঠিক কুকুর-দের মতো নয়। দাঁত বসিয়ে দেয় বটে, কিন্তু এক মুহূর্তও গায়ের সাথে লেপটে থাকতে চায় না। যেমন দ্রুতবেগে আঘাত হানে, তেমনি আবার পেছনে সরে যায় চোখের পলকে।

এদিকে হোয়াইট ফ্যাং-এর হয়েছে আরেক মুশকিল। আঘাত সে হানছে ঠিকই, কিন্তু আসল জায়গায় নয়। গলায় দাঁত বসানোর পক্ষে বুলডগটা বড়ো বেশি খাটো, তাছাড়া ওটার ভারী, চওড়া চোয়াল কাজ করছে বর্মের মতো। ঘাড়ের দু'পাশ আর মাথা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে বুলডগটার, কিন্তু এখনো তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি ঘায়েল হয়ে পড়ার কোনোরকম লক্ষণ। আবার চিৎকার করে উঠলো উল্লসিত জনতা, সামনা থমকে দাঁড়ালো বুলডগটা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। এক কামড়ে একটা কান কেটে নিয়ে সরে গেলো পেছনে। গুরুগম্ভীর ডাক ছেড়ে ছুটে গেলো বুলডগটা, এক চুলের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর গলা।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চললো সময়। যতো জায়গায় আঘাত হানা সম্ভব, তার কিছুই বাদ রাখলো না হোয়াইট ফ্যাং। সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই বুলডগটার। শত্রুর গলায় এক-বার দাঁত বসাতে পারলেই যে তার সবরকম জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে, এটা যেন জেনে গেছে সে।

এবারে চেরোকীকে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা চালাতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু চেরোকী বড়ো বেশি খাটো, যেন লেপটে আছে মাটির সাথে। একবার চেরোকী পাশ ফিরতেই কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু উচ্চতার অতিরিক্ত ভারসাম্যের কারণে আঘাতটা জুতসই হলো না। বরং ভিগবাজি খেয়ে উল্টোদিকে আছড়ে পড়লো সে। জীবনে এই প্রথম ভারসাম্য হারালো হোয়াইট ফ্যাং। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই আবার উঠে পড়লো সে, কিন্তু তার আগেই গলায় চেপে বসলো চেরোকীর দাঁত।

কামড়টা ঠিক জায়গায় পড়েনি। পড়েছে গলা থেকে বেশ কিছুটা নিচে, প্রায় বুকের ওপর। তবু ওখানেই কামড়ে ধরে স্থির হয়ে রইলো চেরোকী। বুলডগটাকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে পাগলের মতো লাফাতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। এটা যেন একটা ফাঁদ, বুকের ওপরে ঝুলে থাকা এই ওজনটা যেন তার স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লোপ পেলো তার। সে যে বেঁচে আছে, আর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে, এটা প্রমাণ করতেই যেন ছুটে বেড়াতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

বৃত্ত তৈরি করে বন্‌বন্ করে ঘুরলো সে, তীব্র ঝাঁকুনি দিলো, দিক পরিবর্তন করলো বিদ্যুদ্বেগে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এক ফোঁটা শিথিল হলো না চেরোকীর কামড়। সে জানে, কৌশলে কোনোরকম ভুল হয়নি তার। শত্রু যতোই লাফাক-ঝাঁপাক, কিছু যায় আসে না। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, কামড় যেন ছুটে না যা

অবশেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। বুঝতে পারছে না, এবার কী করা উচিত। জীবনে লড়াই সে কম করেনি, কিন্তু এরকম ঘটনায় মুখোমুখি হতে হয়নি কখনোই। পক্ষান্তরে চামড়া

চিবুতে চিবুতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে চেরোকী। সামান্য শরীর ঝাঁকাচ্ছে সে, আর তিলতিল করে এগিয়ে যাচ্ছে হোয়াইট ফ্যাং-এর গলার দিকে। বুলডগের স্বভাবই এরকম। কোনো কিছু পেলেই আঁকড়ে ধরে তারা, তারপর সদ্ব্যবহার করে সুযোগের। সুযোগ আসছে, যখন চুপ করে থাকছে হোয়াইট ফ্যাং আর যখন হোয়াইট ফ্যাং লাফাচ্ছে, স্রেফ কামড়টা বজায় রেখে ঝুলে থাকছে চেরোকী।

কিছুক্ষণ পর হোয়াইট ফ্যাংকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসলো সে। এবারে বিড়ালের মতো পা একত্র করে চেরোকীর পেটের নিচে আঁচড়াতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। তৎক্ষণাৎ শরীরটা ঝাঁকিয়ে শত্রুর পায়ের আওতার বাইরে চলে গেলো চেরোকী। ওভাবে আঁচড়াবার সুযোগ দিলে যে দেখতে দেখতে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে, এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

হতভম্ব হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এর আগেও চরম বিপদে পড়েছে সে। লিংক্সটা, কিংবা একসাথে দু'টো কুকুরের বিপক্ষে লড়তে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাকে। কিন্তু এখন গলার সাথে যেটা লটকে আছে, এই মৃত্যু একেবারেই নাছোড়—কোনো নিস্তার নেই এর হাত থেকে। সত্যি বলতে কি, আরো আগেই মারা যেতো হোয়াইট ফ্যাং। স্রেফ গলার নরম চামড়া আর ঘন লোম বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। তবে চেরোকীও ছাড়ার পাত্র নয়। একটু একটু করে গলার চামড়াটা মুখে পুরতে লাগলো সে। স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দম।

লড়াই যে শেষ হয়ে আসছে, এটা বুঝতে পারলো সবাই। আনন্দে নাচতে লাগলো চেরোকীর সমর্থকেরা, তারা এখন যে-কোনো শর্তে

বাজি ধরতে রাজি। ওদিকে একেবারেই মুষড়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং-এর সমর্থকেরা। এক ডলারে দশ ডলার কিংবা এক ডলারে বিশ ডলার বাজি ধরার ইচ্ছে আর তাদের নেই। শুধু একজন লোকই এখনো এক ডলারে পঞ্চাশ ডলার হিসেবে বাজি ধরতে রাজি। বিউটি স্মিথ। বৃত্তের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে, তারপর হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে আঙুল তুলে হেসে উঠলো খিকখিক করে। মাথার ভেতরে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো, অতিরিক্ত শক্তিটুকু ব্যয় করে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের শত্রুটাকে নিয়ে বৃত্তের ধার ঘেঁষে ছুটতে লাগলো সে। বারবার পড়ে গেলো, টলতে টলতে উঠে আবার ছুটলো, শরীরটা ঝাঁকালো এপাশে-ওপাশে। কিন্তু কিছুতেই ছিটকে পড়ে না গলায় লটকে থাকা মৃত্যুটা।

অবশেষে সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে হুমড়ি খেয়ে পেছনদিকে পড়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। সেই সুযোগে গলার আরো খানিকটা চামড়া মুখে পুরে নিলো বুলডগটা। 'চেরোকী' 'চেরোকী' বলে চিৎকার করতে লাগলো উল্লসিত জনতা। আর তাই শুনে খুদে লেজটা ঘনঘন নাড়াতে লাগলো সে। কিন্তু কামড় শিথিল হলো না একটুও।

ঠিক এই সময় ঘটলো একটা ঘটনা। দূর থেকে ভেসে এলো ঘণ্টার শব্দ। বিউটি স্মিথ ছাড়া আর সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো পুলিশের কথা ভেবে। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেলো, দু'জন লোক আসছে একটা স্লেজে চড়ে। এক জায়গায় এতো লোক দেখে কৌতূহলী হয়ে তারা দাঁড় করালো স্লেজটাকে। বেশ বয়স হয়েছে মোটা গোঁফওয়ালা স্লেজ চালকটার। কিন্তু অনাজন তরুণ, দীর্ঘকায়। সম্ভবত দীর্ঘ যাত্রার কারণেই তার নিখুঁতভাবে কামানো মুখটা হয়ে উঠেছে টকটকে লাল।

হোয়াইট ফ্যাং এখনো মাঝেমধ্যে নড়ে উঠছে বটে, কিন্তু তার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। স্রেফ প্রাণটা এখনো যায়নি, তাই এ নড়ে ওঠা। ওদিকে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে শক্তিশালী একজোড়া চোয়াল। গলার মহাধমনীটা কাটা না পড়লেও আর কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই মারা পড়বে হোয়াইট ফ্যাং।

হোয়াইট ফ্যাং নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে দেখে যেন উন্মাদ হয়ে গেলো বিউটি স্মিথ। ঝাঁপিয়ে পড়ে একের পর এক লাথি মারতে লাগলো সে মুমূর্ষু জানোয়ারটাকে। জনতার ভেতর থেকে দু'একটা প্রতিবাদ ভেসে এলো, তারপর চুপ করলো সবাই। একটা কুকুরের মৃত্যু এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। লাথির পর লাথি চালাচ্ছে বিউটি স্মিথ, এই সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো আগন্তুক তরুণটি। লাথি মারার জন্যে আবার পা তুলতেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লো বিউটি স্মিথ।

'কাপুরুষের দল!' জনতার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠলো তরুণটি। 'জানোয়ার কোথাকার!'

রাগে চোখদু'টো যেন জ্বলছে তার। ধীরে ধীরে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলো বিউটি স্মিথ। তরুণটি এই অঞ্চলে একেবারেই নতুন। সুতরাং বিউটি স্মিথ যে কতোখানি কাপুরুষ, জানা ছিলো না তার। ফলে, সামনের লোকটা আক্রমণ করতে আসছে ভেবে আবার ঘুসি চালালো সে। ছিটকে বরফের ওপর পড়ে গেলো বিউটি স্মিথ। এবং পড়েই রইলো। ওই যুবকটার মুখোমুখি হবার চেয়ে বরফের ওপর পড়ে থাকাই নিরাপদ, এটা বুঝতে পেরেছে সে।

'এদিকে এসো, ম্যাট, হাত লাগা.' স্লেজ চালকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলো যুবক।

দু'জনেই উপুড় হলো কুকুরদু'টোর ওপর। ম্যাট চেপে ধরে। হোয়াইট ফ্যাংকে, চেরোকীর কামড় একটু আলগা হলেই টেনে ছাড়িয়ে নেবে গলাটা। ওদিকে যুবকটা চেপে ধরলো চেরোকীর চোয়াল, ফাঁক করবার চেষ্টা করলো প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু একটুও শিথিল হলো না বুলডগের কামড়। 'জানোয়ার। সবগুলোই জানোয়ার!' প্রত্যেকবার শক্তি প্রয়োগ করার ফাঁকে ফাঁকে চেঁচাতে লাগলো সে।

একের পর এক প্রতিবাদ আসতে লাগলো জনতার দিক থেকে। মজা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রেগে গেছে সবাই। কিন্তু মাথা তুলে কড়া চোখে তাকালো যুবক, সাথেসাথে বন্ধ হয়ে গেলো যাবতীয় প্রতিবাদ।

'জানোয়ারের দল!' বলে মাথা নিচু করে আবার কাজে মন দিলো সে।

'ওভাবে চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না, মিঃ স্কট,' অবশেষে বলে উঠলো ম্যাট।

দু'জনেই ভালোভাবে লক্ষ্য করলো জড়াজড়ি করে থাকা হোয়াইট ফ্যাং আর চেরোকীকে।

'প্রচুর রক্ত পড়েছে,' ঘোষণা করলো ম্যাট।

পড়ছে না।'

'কিন্তু আবার শুরু হতে কতোক্ষণ।' বললো স্কট। 'এই যে, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো জায়গাটা।'

হোয়াইট ফ্যাংকে বাঁচাবার জন্যে ক্রমেই উতলা হয়ে পড়ছে স্কট। এবারে চেরোকীর মাথায় ঘুসি মারতে লাগলো সে। কিন্তু ঘুসির পর ঘুসি খেয়েও ঢিলে হলো না বজ্রকঠিন চোয়াল। খুদে লেজটা জোরে জোরে নাড়তে লাগলো চেরোকী। যেন বলতে চায়, 'তুমি মারছো না, সেটা তো ঠিকই বুঝতে পারছি, কিন্তু তাই বলে কামড় ছাড়ি কী

করে, বলো। কাজটা তো আমি ভুল করিনি।'

'তোমাদের মধ্যে কি কেউ সাহায্য করবে না?' শেষমেষ জনতার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলো স্কট।

কিন্তু একজনও এগিয়ে এলো না, বরং হরেক রকম উপদেশ বিতরণ করতে লাগলো ব্যঙ্গাত্মক সুরে।

'ওটার দাঁতের ফাঁকে কিছু একটা ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই,' বললো ম্যাট।

হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে বুলডগটার দাঁতের ফাঁকে ঢোকাবার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো স্কট। কিছুক্ষণ পর দাঁতের সাথে ইস্পাতের নলের সংঘর্ষের ফলে একটা শব্দ হলো খরখর করে। চুপ করে থাকা আর সম্ভব হলো না টিম কীনানের পক্ষে। বৃত্তের ভেতরে ঢুকে স্কটের কাঁধে একটা থাবা মেরে ধমকে উঠলো সে:

'সাবধান! আমার কুকুরের দাঁত যেন না ভাঙে!'

'আপাতত দাঁত ভাঙারই চেষ্টা করছি,' বললো স্কট, 'খুব অসুবিধে হলে ভেঙে দেবো ঘাড়টা।'

'আবার বলছি, একটা দাঁতও যেন না ভাঙে!' আগের চেয়েও কড়া গলায় ধমকে উঠলো টিম কীনান।

কিন্তু সে-ধমকের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না স্কটের মধ্যে। নিজের কাজ করতে করতে মাথা তুলে ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলো সে:

'C   রি কুকুর?'

খেঁকিয়ে করে উঠলো টিম কীনান।

'তাহলে তুমিই ছাড়িয়ে নাও।'

'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোমাকে,' টেনে টেনে বললো

জুয়াড়ী, 'বুলডগের চোয়াল ফাঁ কোনো
নেই।'

'তাহলে দূর হও এখান থেকে,' জবাব দিলো স্কট, 'অযথা ঝামেলা পাকাতে এসো না।'

টিম কীনান অবশ্য গেলো না, কিন্তু ওর দিকে আর ফিরেও তাকালো না স্কট। রিভলভারের নলটা ইতোমধ্যেই চোয়ালের এক পাশে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। আরো বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর কোনোমতে আরেক পাশেও ঢুকিয়ে দিতে পারলো। এবারে সাবধানে একটু করে নলের চাড় দিয়ে চেরোকীর চোয়াল ফাঁক করতে লাগলো সে, একইসাথে একটু একটু করে হোয়াইট ফ্যাং-এর গলাটা ছাড়িয়ে নিতে লাগলো ম্যাট।

'তোমার কুকুরটাকে সামলানোর জন্যে তৈরি হও,' টিম কীনানের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো স্কট।

কোনো কথা না বলে ঝুঁকে পড়ে শক্ত হাতে চেরোকীকে ে ধরলো টিম কীনান।

'হ্যাঁ, এইবা ,' শেষ চাড় দিলো স্কট।

অবশেষে আলাদা হলো কুকুরদু'টো, কিন্তু রাগে ছটফট করতে লাগলো বুলডগটা।

উঠে দাঁড়ানোর জন্যে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলো হোয়াইট ফ্যাং। একবার দাঁড়ালোও কোনোমতে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পড়ে গেলো বরফের ওপর। দেহের ভার বইবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তার পা। চোখদু'টো আধবোজা, চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জিভ। সব মিলিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা কোনো কুকুরের মতোই দেখাচ্ছে হোয়াইট ফ্যাংকে। নিচু হয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলো

ম্যাট।

বললো, 'মোটামুটি ভালোভাবেই দম নিচ্ছে, তবে আরেকটু দেরি হলে আর দেখতে হতো না।'

এবারে বিউটি স্মিথ এসে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং-এর কাছে।

'আচ্ছা, ম্যাট, স্লেজের ভালো একটা কুকুরের দাম কতো?' জানতে চাইলো স্কট।

'তিনশো ডলার।'

'কিন্তু এরকম চিবিয়ে খাওয়া কুকুর হলে?' পা দিয়ে হোয়াইট ফ্যাংকে মৃদু গুঁতো দিলো স্কট।

'বড়োজোর অর্ধেক।'

স্কট এবার ঘুরলো বিউটি স্মিথের দিকে।

'শুনলে, মিঃ ানোয়ার? তোমার কুকুরটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ওটার দাম পাবে দেড়শো ডলার।'

পকেট থেকে ডলারের নোটগুলো বের করে গুনতে লাগলো সে।

হাতদু'টো পেছনদিকে নিয়ে গেলো বিউটি স্মিথ, টাকা নিতে রাজি নয় সে।

বললো, 'কুকুর আমি বেচবো না।'

'তোমার বাবা বেচবে,' বল ।স্কট। 'এখন থেকে কুকুরটা এই নাও টাকা।'

একটু পিছিয়ে গেলো বিউটি স্মিথ।

এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্কট, হাত তুললো ঘুসি মারার জন্যে। ভয়ে মাথা নিচু করলো বিউটি স্মিথ।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'এটা আমার কুকুর। এটার ওপর শুধু আমারই অধিকার আছে।'

'সে-অধিকার তুমি হারিয়েছো,' চেঁচিয়ে উঠলো স্কট। 'যাই হোক, টাকাটা নেবে? না আরেকটা ঘুসি লাগাবো?'

'বেশ, বেশ, নিচ্ছি,' মিনমিন করে বললো বিউটি স্মিথ। 'কিন্তু এতে আমার মনের সায় নেই। কুকুরটা আমার। ওটাকে বেচবো কি বেচবো না, সেটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের জিনিসের ওপর অধিকার আছে।'

'ঠিক,' টাকা দিতে দিতে বললো স্কট। 'প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজ নিজ জিনিসের ওপর অধিকার আছে। কিন্তু তুমি তো আর মানুষ নও। তুমি একটা জানোয়ার।'

'বেশ, আগে ডসনে যেতে দাও,' ভয় দেখালো বিউটি স্মিথ। 'মামলা করবো তোমার নামে।'

'ডসনে যাবার পর যদি টুঁ শব্দ করো, একেবারে শহর ছাড়াবো তোমাকে। বুঝেছো?'

চুপ করে রইলো বিউটি স্মিথ।

'বোঝোনি?' কড়া ধমক লাগালো স্কট।

'বুঝেছি,' পিছু হটতে হটতে বললো বিউটি স্মিথ।

'শুধু বুঝেছি? আর কিছু বলতে হবে না?'

'বুঝেছি, স্যার।' দাঁত বের করলো বিউটি স্মিথ।

'ওই দেখো, দাঁত বের করেছে! কামড় দিতে পারে!' বলে উঠলো কে যেন। হেসে লুটিয়ে পড়লো সবাই।

ঝামেলা হতে পারে ভেবে ইতোমধ্যেই কেটে পড়েছে অনেকে। কিছু কিছু লোক জটলা পাকিয়েছে এখানে-সেখানে। এমনি একটা জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো টিম কীনান।

'লোকটা কে হে?' জানতে চাইলো

'উইডন স্কট,' জবাব দিলো কে যেন।

'এই উইডন স্কটটা আবার কে?'

'মস্তবড়ো এঞ্জিনিয়ার। খনি বিশেষজ্ঞ। যদি বিপদে পড়তে না চা ওর কাছ থেকে সরে থেকো। বড়োবড়ো অফিসারদের সাথে দহরম-মহরম আছে ওর। গোল্ড কমিশনারের সাথে তো একগলা খাতির।'

'সে আমি প্রথমেই বুঝেছি,' মন্তব্য করলো জুয়াড়ী। 'সেজন্যেই তো কিছু বলিনি।'

উনিশ

অপরাজেয়

'কোনো আশা নেই,' বললো উইডন স্কট।

নিজের কেবিনের সিঁড়িতে বসে আছে সে। কথাটা বলে ম্যাটের দিকে চাইতে সে-ও কাঁধ ঝাঁ ালো হতাশ ভঙ্গিতে।

একইসাথে দু'জন তাকালো শেকলে বাঁধা হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। সেজের কুকুরগুলোর নাগাল পাবার জন্যে লাফালাফি করছে সে, ত খিঁচোচ্ছে ভয়ানকভাবে। প্রথম প্রথম ওই কুকুরগুলোও তেড়ে আসতো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। কিন্তু ম্যাটের গদার বাড়ি

খেতে খেতে তারা বুঝতে পেরেছে, হোয়াইট ফ্যাংকে ঘাঁটানো চলবে না।

'এটা একেবারে নেকড়েই, পোষ মানার কোনোরকম সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না,' বললো উইডন স্কট।

'সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়,' মন্তব্য করলো ম্যাট। 'তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, পালিয়ে যাবে না ও।'

একটু থেমে আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে।

'তোমার যা মনে হচ্ছে, সেটা আবার লুকিয়ে রাখছো কেন?' তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো স্কট। 'সব খুলে বলো দেখি!'

বুড়ো আঙুল দিয়ে হোয়াইট ফ্যাংকে দেখিয়ে দিলো ম্যাট।

'ওটা কুকুর হোক বা নেকড়েই হোক—যথেষ্ট পোষ মেনেছে ইতো-মধ্যেই।'

'না!'

'আমি বলছি—হ্যাঁ। বুকের ওপরের দাগগুলো লক্ষ্য করেছেন? কোনো একসময় স্লেজ টেনেছে।'

'ঠিকই বলেছো, ম্যাট। বিউট স্মিথের হাতে পড়ার আগে স্লেজ টেনেছে ও।'

'তাহলে চেষ্টা করলে হয়তো ওকে দিয়ে আবার স্লেজ টানানো যেতে পারে।'

'বলো কি?' উৎসাহে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্কটের। কিন্তু পরক্ষণেই হতাশভাবে মাথা নাড়াতে লাগলো সে, 'না। তা কিছুতেই সম্ভব নয়। দু'সপ্তাহ কেটে গেলো, কিন্তু দিনদিন ও আরো বুনো হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয়, ওকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত,' বললো ম্যাট।

'একবার ছেড়ে দিয়েই দেখুন না !'

অবিশ্বাসে চোখ বড়োবড়ো হয়ে গেলো স্কটের।

'হ্যাঁ,' বললো ম্যাট, 'চেষ্টা তো আপনিও করেছেন, কিন্তু কখনোই গদা হাতে নেননি।'

'এবার তাহলে তুমিই চেষ্টা করে দেখো।'

একটা গদা নিয়ে এগিয়ে গেলো ম্যাট। খাঁচার বন্দী সিংহ যেমন তার ট্রেনারের চাবুকের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনিভাবে চেয়ে চেয়ে গদাটাকে দেখতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

'দেখেছেন, চোখ সরাচ্ছে না,' বললো ম্যাট। 'লক্ষণটা ভালো। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে ওর। একেবারে পাগল নয়। যতোক্ষণ হাতে গদা থাকবে, আমাকে ঘাঁটাতে আসবে না।'

ম্যাটের হাত গলার দিকে এগিয়ে আসতে গরগর করে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু অন্য হাতে ধরা গদাটার দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ সরালো না। শেকলটা খুলে দিয়ে পিছিয়ে গেলো ম্যাট।

সে যে স্বাধীন, তা যেন বুঝতেই পারলো না হোয়াইট ফ্যাং। সেই কবে বিউটি স্মিথের হাতে পড়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি সে। শুধু লড়াইয়ের সময় ছাড়া পেতো। লড়াই শেষ হবার সাথেসাথে আবার ঢুকিয়ে দেয়া হতো খাঁচায়।

এখন কী করা উচিত, বুঝে উঠতে পারলো না হোয়াইট ফ্যাং। নিশ্চয় এবার তাকে নিয়োজিত হতে হবে নতুন কোনো পৈশাচিক কাজে। যে-কোনো সময় মার শুরু হতে পারে, সে-ব্যাপারেও হোয়াইট ফ্যাং সম্পূর্ণ সতর্ক। কেবিনের ধার থেকে একবার ঘুরে এলো সে। কিছুই ঘটলো না। হতভম্ব হয়ে হাত আষ্টেক দূরে বসে একদৃষ্টে সে লক্ষ্য করতে লাগলো মানুষ দু'টোকে।

'পালিয়ে যাবে না তো ?' স্কটের গলায় সন্দেহ।

কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাট। 'গেলে যাবে। কিন্তু এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই আমাদের।'

'বেচারি,' সমবেদনার সুর ধ্বনিত হলো স্কটের কণ্ঠে। 'এখন শুধু একটা জিনিসই ওর দরকার। মানুষের ভালোবাসা।' কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

আর প্রায় সাথেসাথে বেরিয়ে এসে এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। লাফিয়ে সরে গেলো হোয়াইট ফ্যাং, মাংসের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলো সন্দিগ্ধ চোখে।

'এই, মেজর, সাবধান!' চিৎকার করে উঠলো ম্যাট, কিন্তু ততো-ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মাংসের টুকরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুরটা। মুখ দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আঘাত হানলো হোয়াইট ফ্যাং। কাঁধের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো মেজর। দ্রুত ছুটে গেলো ম্যাট, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং অনেক বেশি দ্রুত। মেজরের রক্তে লাল হয়ে গেলো আশপাশের বরফ।

'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেলো, কিন্তু উচিত শিক্ষা হয়েছে মেজ-রের,' বললো স্কট।

হোয়াইট ফ্যাংকে লাথি মারার জন্যে একটা পা তুলেছিলো ম্যাট, চোখের পলকে সে-পায়ে দাঁত বসিয়ে দিলো হোয়াইট ফ্যাং।

'ব্যাটা ঠিকই কামড়েছে,' প্যান্ট তুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করতে করতে বললো ম্যাট।

'তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পোষ মানবে না ও। এখন শুধু একটা ব্যবস্থাই আছে।'

কথা বলতে বলতেই রিভলভারটা বের করলো স্কট।

'শুনুন, মিঃ স্কট,' বললো ম্যাট ; 'বিউটি স্মিথের কাছে থাকার সময় নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছে ও। সুতরাং এতো তাড়াতাড়ি একেবারে শান্ত হয়ে যাবে, এটা আশা করা ঠিক নয়। সময় দিতে হবে ওকে।'

'কিন্তু মেজরের অবস্থাটা দেখেছো?'

ম্যাট তাকালো বরফের ওপর পড়ে থাকা কুকুরটার দিকে। ওটার শেষ সময় প্রায় উপস্থিত।

'মিঃ স্কট, একটু আগে আপনি নিজেই বলেছেন, উচিত শিক্ষা হয়েছে মেজরের। ঠিকই বলেছেন। হোয়াইট ফ্যাং-এর মাংসে ভাগ বসাতে গিয়ে মারা গেছে ও। নিজের মাংসের টুকরোটাও রক্ষা করতে না পারলে সে আবার একটা কুকুর হলো?'

'কুকুরদের কথা না হয় আলাদা, কিন্তু তোমার নিজের কথাটা একবার চিন্তা করো।'

'আমারও উচিত শিক্ষা হয়েছে,' জেদী সুরে বললো ম্যাট। 'ওকে লাথি মারতে যাবার দরকারটা কি ছিলো আমার? সেরকম কোনো অপরাধ তো ও করেনি!'

'কিন্তু ও তো কিছুতেই দোষ মানবে না,' বললো স্কট। 'সুতরাং মেরে ফেলাটাই ভালো।'

'মিঃ স্কট, আমার মনে হয়, হতভাগাটাকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত। দিনের পর দিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছে কুকুরটা। তাই শোধরাতে কিছু সময় তো লাগবেই। আর একটা সুযোগ দিন বেচারিকে। তারপরেও যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, কথা দিচ্ছি, আমি নিজের হাতে শেষ করে দেবো ওকে।'

'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, ওকে আমি সত্যিই মেরে ফেলতে চাই

কিনা.' রিভলভারটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললো স্কট। 'ঠিক আছে, তাহলে ছেড়ে দিয়েই দেখা যাক, কী পরিবর্তন হয় ওর। আপাতত এখনই একবার পরীক্ষা করে দেখি।'

ধীরে ধীরে হোয়াইট ফ্যাং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, কথা বলতে লাগলো নরম গলায়।

'খালি হাতে না গিয়ে একটা গদা সাথে রাখা উচিত,' সাবধান করে দিলো ম্যাট।

মাথা ঝাঁকালো স্কট। খালি হাতেই হোয়াইট ফ্যাং-এর মন জয় করতে চায় সে।

সন্দেহ ফুটে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দু'চোখে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কারণ ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে সে। ঈশ্বরদের কুকুরটাকে খতম করে দিয়েছে, ঈশ্বরের সাথীটাকেও কামড়াতে ছাড়েনি। সুতরাং ভয়াবহ শাস্তি যে পেতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু আজ সে বেপরোয়া, কারো বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি নয়। সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেলো, বেরিয়ে পড়লো শাদা ঝকঝকে দাঁত, চোখে সতর্ক দৃষ্টি—যে-কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে আর কোনোরকম দ্বিধা নেই তার। ঈশ্বরটার হাতে গদা নেই বলে তাকে আরো এগিয়ে আসতে দিলো সে। কিন্তু হাতটা যে ক্রমেই নেমে আসছে! মাথা নিচু করলো হোয়াইট ফ্যাং। আরো নেমে এলো হাতটা। আরো নিচু হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতে চাইলো সে। কিন্তু হাতটা যে থামে না। নিশ্চয় ওই হাতে লুকিয়ে আছে ভীষণ কোনো বিপদ কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা। ঈশ্বরদের হাতকে হাড়েহাড়ে চেনা আছে তার। তবু কামড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হোয়াইট ফ্যাং-এর ছিলো না। কিন্তু হাতটা একেবারে মাথা ছুঁইছুঁই হতে তার সহজাত

প্রবৃত্তি বাধ্য করালো তাকে।

উইডন স্কট ভেবেছিলো, কুকুরটা কামড়াবার চেষ্টা করলে তার আগেই হাত সরিয়ে নিতে পারবে সে। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর ক্ষিপ্রতা সম্বন্ধে ধারণা ছিলো না তার। হাত টান দেয়ার একটা চেষ্টা সে করলো বটে, কিন্তু তার আগেই ঠিক সাপের ছোবল মারার গতিতে আঘাত হানলো হোয়াইট ফ্যাং।

চিৎকার করে উঠে আরেক হাত দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলো স্কট। ম্যাট ছুটে গেলো তার পাশে। দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে ছ'ধাপ পিছিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এখন কী হবে, সে খুব ভালো করেই জানে। বিউটি স্মিথের কাছে থাকার সময়ে মারের এই ধরন-ধারণ মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

'তুমি আবার এখানে কি করতে এলে?' ম্যাটকে ধমক লাগালো উইডন স্কট।

ম্যাট ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লো কেবিনের ভেতরে, পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে এলো একটা রাইফেল নিয়ে।

'প্রতিজ্ঞা পালন করতে এসেছি,' ঠাণ্ডা গলায় বললো ম্যাট: 'আপনাকে তো আগেই কথা দিয়েছি!'

'খবরদার!'

'দেখুন না, কী অবস্থা করি শয়তানটার।'

একটু আগেই নিজে কামড় খাওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট ফ্যাং-এর পক্ষে ওকালতি করছিলো ম্যাট। এবারে সেই একই ভূমিকা নিলো উইডন স্কট। ফলে মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে ছ'ছ'বার প্রাণে বাঁচলো হোয়াইট ফ্যাং।

'ওকে একটা সুযোগ দেয়ার কথা বলেছো তুমি। আমারও তা-ই

ইচ্ছে। সুতরাং সে-সুযোগ থেকে আমরা ওকে বঞ্চিত করতে পারি না। যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করো, তাহলে বলবো, উচিত শিক্ষাটা এবার আমার হয়েছে। ওই দেখো—কেন করছে সে!'

চল্লিশ ফুট মতো দূরে দাঁড়িয়ে, ম্যাটের দিকে চেয়ে রক্ত-হিম-করা গর্জন ছাড়ছে হোয়াইট ফ্যাং।

'ব্যাটার বুদ্ধি দেখেছো!' বললো স্কট। 'আগ্নেয়াস্ত্র কী জিনিস, সেটা ও ভালোভাবেই বোঝে। জানোয়ার হওয়া সত্ত্বেও যার এতো বুদ্ধি, তাকে অবশ্যই বাঁচবার সুযোগ দেয়া উচিত। রাইফেলটা নামাও।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' স্কটের কথায় পুরো সায় দিয়ে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো ম্যাট।

'কিন্তু ওর দিকে খেয়াল করেছো!' চরম বিস্ময় ফুটে উঠলো স্কটের কণ্ঠে।

একেবারে শান্ত হয়ে চুপচাপ বসে আছে হোয়াইট ফ্যাং।

'এ কী করে সম্ভব! ব্যাপারটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখো তো, ম্যাট। জানোয়ারের এতো বুদ্ধি হয়!'

রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালো ম্যাট। সাথেসাথে উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং, গজরাতে শুরু করলো ভীষণভাবে। হিংস্র দু'চোখ মেলে ম্যাটের দিকে চেয়ে আছে সে।

ধীরে ধীরে রাইফেলটা কাঁধে তুললো ম্যাট। ক্রমেই বেড়ে চললো হোয়াইট ফ্যাং-এর গর্জন। তারপর একসময় রাইফেলটা যখন ঠিক তার দিকে স্থির হলো, লাফিয়ে কেবিনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। বিস্ময়ে বোকা বনে গেলো ম্যাট।

গম্ভীর মুখে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো সে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরলো উইডন স্কটের দিকে।

'আপনার সাথে আমি পুরোপুরি একমত, মিঃ স্কট। জানোয়ার হওয়া সত্ত্বেও যে এতো বুদ্ধি রাখে, তাকে খুন করাটা শুধু অনুচিতই নয়—রীতিমতো অন্যায়।'

বিশ

স্নেহময় প্রভু

উইডন স্কটকে এগিয়ে আসতে দেখেই গর্জে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। যেন বলতে চায়, শাস্তির কাছে সহজে মাথা পেতে দেবে না সে। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাতটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে স্কট। হোয়াইট ফ্যাং জানে, মাঝে মাঝে মানুষ-প্রভুরা শাস্তি দিতে দেরি করে। এ-ক্ষেত্রেও সে-রকমই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে ঈশ্বরের পবিত্র দেহে কামড় দিয়েছে সে। বিশেষ করে সে-ঈশ্বর আবার শাদা চামড়ার গোত্র জাতের ঈশ্বর। এই মহাপাপের জন্যে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ভয়ঙ্কর শাস্তি।

কিন্তু বেশ কয়েক হাত দূরে বসে পড়লো ঈশ্বরটা। তার হাবভাবেও বিপজ্জনক কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। শাস্তি দেয়ার সময় ঈশ্বরেরা

দাঁড়িয়ে থাকে। ছাড়া এই ঈশ্বরের হাতে গদা, চাবুক কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র কিছুই নেই। এমনকি তাকেও বেঁধে রাখা হয়নি। ইচ্ছে করলে যে-কোনো সময় পালিয়ে যেতে পারে সে। অবশ্য আপাতত সেরকম কোনো ইচ্ছে তার নেই। দেখাই যাক না, কী হয়!

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ঈশ্বরটা। গজরাতে গজরাতে একসময় হোয়াইট ফ্যাং চুপ করে গেলো। আর ঠিক তখনই কথা বলে উঠলো ঈশ্বর। সাথেসাথে আবার গর্জে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু ঈশ্বরটা কথা বলছে খুবই নরম গলায়। শুনে ভেতরে কী যেন একটা গলে যাচ্ছে তার। শান্ত হয়ে বসে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। জীবনে এই প্রথম মানুষকে বিশ্বাস করার একটা ইচ্ছে জাগলো মনে।

অনেকক্ষণ পর উঠে ঈশ্বর চলে গেলো ঘরের ভেতরে, ফিরেও এলো প্রায় সাথেসাথেই। সতর্ক দৃষ্টিতে তার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করলো হোয়াইট ফ্যাং। না, এবারেও তার হাতে চাবুক, গদা কিংবা অন্য কোনো অস্ত্র নেই। এমনকি আহত হাতটাতেও সে লুকিয়ে রাখেনি। আগের মতোই বেশ কয়েক হাত দূরে বসে পড়লো ঈশ্বরটা। মাংসের একটা টুকরো বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। কান খাড়া করে, সন্দেহের দৃষ্টিতে মাংসের টুকরোটার দিকে চেয়ে রইলো হোয়াইট ফ্যাং। নিজের অজান্তেই টানটান হয়ে গেছে সমস্ত স্নায়ু, ঈশ্বরটা উল্টোপাল্টা কোনো আচরণ করলেই লাফিয়ে সরে যাবে নিরাপদ দূরত্বে।

এখনো শাস্তি দেয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং তার মুখের সামনে মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মাংসটার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়লেও তখনই ওটার দিকে এগিয়ে যাবার সাহস তার হলো না। ঈশ্বরদের প্রতারণার শেষ নেই। তাদের আপাতনিরীহ হাবভাবের পেছনেও লুকিয়ে থাকে বিপদ। বিশেষ করে অতীতে বেশ

কয়েকবার মাংসের লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে যাওয়ার পর শাস্তি দেয়া হয়েছে তাকে।

অবশেষে মাংসের টুকরোটা ছুঁড়ে দেয়া হলো তার পায়ের কাছে। মাংসটা শুঁকলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু ঈশ্বরের দিক থেকে চোখ সরালো না। তারপর ধীরে ধীরে ওটাকে মুখে পুরলো সে। কিছুই ঘটলো না। বরং আরেক টুকরো মাংস তার দিকে বাড়িয়ে দিলো ঈশ্বর। এবারেও এগিয়ে গেলো না সে। ফলে এই মাংসটাও ছুঁড়ে দেয়া হলো তার সামনে। এভাবে কয়েকবার দেয়ার পর আর ছুঁড়ে দিতে রাজি হলো না ঈশ্বর, মাংস-ধরা হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে বসে রইলো চুপচাপ।

মাংসটা চমৎকার, খিদেও পেয়েছে ভীষণ। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এবং মনে মনে ঠিক করলো, মাংসটা হাত থেকেই খাবে সে। কাছে যেতে ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেলো তার, গলা দিয়ে বেরোতে লাগলো মৃদু গর্জন। যেন বুঝিয়ে দিতে চায়, কোনোরকম চালাকি সে সহ্য করবে না। ধীরে ধীরে মাংসটা খেয়ে নিলো হোয়াইট ফ্যাং। তবু কিছুই ঘটলো না। শাস্তিরও কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না এখনো।

গাল দু'টো চেটে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। ঈশ্বরটা কথা বলে চলেছে খুবই নরম গলায়। ওই কথা শুনে এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে, যা ওর আগে কখনো হয়নি। মনের একেবারে ভেতরে কোন্ একটা শূন্যতা যেন ভরে উঠছে ধীরে ধীরে। নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ সতর্ক হয়ে আবার নড়েচড়ে বসলো হোয়াইট ফ্যাং। ওভাবে নরম করে কথা বলাও হতে পারে প্রতারণার নতুন কোনো কৌশল।

কথাটা ভাবার প্রায় সাথেসাথেই ঈশ্বর একটা হাত বাড়িয়ে দিলো

তার দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছে সে। এবার ওই হাত থেকে নেমে আসবে অভিনব কোনো শাস্তি। কিন্তু হাতটা স্থির হয়ে রইলো একই জায়গায়। অত্যন্ত শান্ত ওই গলা শুনলে ঈশ্বরটাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে জাগে। কিন্তু হাতটাকে যে বিশ্বাস হয় না। দ্বিধাবিভক্ত অনুভূতির আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষমেষ একটা সমঝোতায় এলো সে। মৃদু গর্জন না করে অবশ্য থাকতে পারলো না হোয়াইট ফ্যাং। তবে কামড়াবার কোনো চেষ্টা করলো না, কিংবা পালিয়েও গেলো না। ওদিকে ধীরে ধীরে মাথার ওপরে নেমে এলো হাতটা। স্পর্শ করলো তার দাঁড়ানো লোমের ডগাগুলো। মাটির সাথে মিশে যেতে চাইলো সে। আরো নেমে এলো হাতটা, স্পর্শ করলো আবার। অতি কষ্টে কামড় দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলো হোয়াইট ফ্যাং। মানুষের হাতের স্পর্শ তার কাছে অত্যাচারের নামান্তর। ওই হাত যে কতোখানি অশুভ, তা সে হাড়েহাড়ে জানে। তবু শ্রেষ্ঠ প্রভু তাকে স্পর্শ করতে চায় বলে দাঁতে দাঁত চেপে এই অত্যাচার সহ্য করতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

হাতটা ঘোরাফেরা করতে লাগলো তার সারা শরীরে। গরগর করতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। যেন বুঝিয়ে দিতে চায়, আঘাত করার কোনোরকম চেষ্টা করলে সে-ও ছেড়ে দেবে না। পৃথিবীর সব-কিছুকে বিশ্বাস করলেও মানুষের হাতকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। এই মুহূর্তে যে হাতটা তার শরীরে বুলিয়ে দিচ্ছে আরামের পরশ, এটাই আবার শাস্তি দেয়ার জন্যে তাকে চেপে ধরতে পারে বজ্র-মুষ্টিতে।

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একনাগাড়ে কথা বলে চলেছে ঈশ্বরটা। বেশ আরাম লাগছে তার। বিশেষ করে সে-হাত যখন ডলে দিচ্ছে

কানের গোড়া, সুখের একটা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। তবু অবিশ্বাসটা যে থেকেই যাচ্ছে। সুখ আর যন্ত্রণার এক মিশ্র অনুভূতির দোলায় দুলতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

'ওভাবে চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না।' ময়লা পানিভর্তি একটা গামলা নিয়ে কেবিন থেকে বেরোতে বেরোতে বলে উঠলো ম্যাট।

কথাটা কানে যাবার সাথেসাথে লাফিয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং, গম্ভীর গর্জন ছাড়লো ম্যাটের উদ্দেশে।

করুণার দৃষ্টিতে ম্যাট তাকালো তার মনিবের দিকে।

'কিছু মনে করবেন না, মিঃ স্কট, ওভাবে হোয়াইট ফ্যাংকে শোধরানোর চেষ্টা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কোনো জবাব না দিয়ে মুচকি হেসে হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে এগিয়ে গেলো উইডন স্কট। মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আবার কথা বলতে লাগলো কোমল সুরে। কোনো বাধা দিলো না হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু সন্দেহের চোখে চেয়ে রইলো ম্যাটের দিকে।

'আপনি শুধু একজন বিখ্যাত খনি বিশেষজ্ঞই নন,' কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে নিজের মত পাল্টে নিলো ম্যাট, 'ছোটবেলায় সার্কাসের দলে নাম লেখালেও একইরকম বিখ্যাত হতেন।'

ম্যাটের গলা কানে আসতেই আবার গর্জে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু এবার আর লাফিয়ে সরে গেলো না।

নতুন একটা অধ্যায়ের সূচনা হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর জীবনে, যে জীবনের পেছনে উইডন স্কটের অবদানই সবচেয়ে বেশি। তার অসীম ধৈর্য, সময়োচিত পদক্ষেপই হোয়াইট ফ্যাংকে টেনে তুললো ঘৃণার অতল গহ্বর থেকে

গ্রে বীভার কিংবা বিউটি স্মিথের কাছ থেকে মুহূর্তের জন্যেও যে

জিনিসটি হোয়াইট ফ্যাং পায়নি, তা-ই পেলো সে উইডন স্কটের কাছে। পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকে এ-যাবৎ কোনো কিছুকে পছন্দ করাই ছিলো তার আবেগের সর্বোচ্চ প্রকাশ। উইডন স্কটের সংস্পর্শে আসার পর প্রথমবারের মতো সে বুঝতে পারলো, ভালো-বাসা কী জিনিস।

তবে এই ভালোবাসাও একদিনে আসেনি। উইডন স্কটকে পছন্দ করার ভেতর দিয়েই এর শুরু। পালিয়ে যাবার অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পালিয়ে গেলো না সে। কারণ, বিউটি স্মিথের খাঁচায় বন্দী থাকার চেয়ে অনেক ভালো এখানকার জীবন। তাছাড়া সে যে-ছাঁচে গড়া, তাতে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই তার একজন প্রভুর প্রয়োজন।

প্রভু হিসেবে বিউটি স্মিথের চেয়ে উইডন স্কট হাজার গুণে ভালো। কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর বিষয়-সম্পত্তি পাহারা দেবার ভার নিলো সে। স্লেজ টানা কুকুরগুলো যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন কেবিনের চার-পাশে ঘুরে বেড়ায় হোয়াইট ফ্যাং। প্রথম রাতে যে আগন্তুকটি এলো, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পড়তেই উইডন স্কট ছুটে এসে রক্ষা করলো তাকে। তবে আগন্তুকদের মধ্যে কে চোর আর কে সাধু, সেটা বুঝে নিতে খুব একটা দেরি হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। যারা গটগট করে সোজাসুজি কেবিনের দিকে হেঁটে আসে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। আর যারা পা টিপে টিপে আসে, উঁকিঝুঁকি মারে এদিকে-সেদিকে, তাদের ছাড়া চলবে না কিছুতেই।

প্রত্যেকদিন কখনো না কখনো কুকুরটাকে আদর করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেলো স্কটের। এতোদিন ধরে বিভিন্ন মানুষ এই অবোধ প্রাণীটার ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের সবার হয়ে যেন একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।

১—হোয়াইট ফ্যাং

প্রথম প্রথম বেশ অস্বস্তি বোধ করলেও আদর করতে ইদানীং ভালোই লাগে তার। শুধু একটা অভ্যেসই সে এখনো ছাড়তে পারেনি। প্রভু এসে গায়ে হাত দেয়ার সাথেসাথে গরগর করতে থাকে সে। তবে সে গরগরানির মধ্যে হিংস্রতা নেই। নতুন কোনো লোক অবশ্য এটা শুনে এখনো চমকে ওঠে আতঙ্কে। একমাত্র স্কটই বুঝতে পারে পার্থক্যটা।

দিনে দিনে একটু একটু করে হোয়াইট ফ্যাং-এর পছন্দটা পরিবর্তিত হতে থাকে ভালোবাসায়। পরিবর্তনটা টের পায় সে, তবে ভালোবাসা সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো ধারণা গড়ে তুলতে পারে না। ভালোবাসা তার কাছে অতল, অগাধ একটা শূন্যতা ভরে ওঠার মতো ব্যাপার। প্রভু যতোক্ষণ কাছে থাকে, আনন্দে আপ্লুত হয়ে থাকে তার মন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ প্রভুকে না দেখলেই আবার যেন ফিরে আসে শূন্যতাটা।

এই অনুভূতির সাহায্যে নিজেকে যেন নতুন করে চিনতে শিখলো হোয়াইট ফ্যাং। আগে আরামের প্রতি ছিলো তার প্রচণ্ড দুর্বলতা। কিন্তু এখন প্রভুর জন্যে আরামের প্রতি এসেছে এক ধরনের অনীহা। আগে কোথাও বাসা পাবার সম্ভাবনা থাকলে সে-জায়গার ছায়া মাড়াতো না হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু এখন প্রভুর জন্যে যে-কোনো শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে রাজি। প্রভুকে একনজর দেখার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এখন বসে থাকে কেবিনের সিঁড়িতে। রাতে যখন প্রভু ফিরে আসে, আনন্দে লাফিয়ে ওঠে তার মনটা। প্রভুর হাতের স্পর্শ মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় সমস্ত ক্লান্তি। সত্যি বলতে কি, প্রভুর আদর কিংবা তার সাথে ঘুরে বেড়াবার আনন্দের বিনিময়ে মাংসের টুকরো পাওয়া সে ত্যাগ করতে পারে অনায়াসে।

ভালোবাসাও যেন এক ধরনের ঈশ্বর। এর অনির্বচনীয় মধুর স্পর্শে

ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগলো আসল হোয়াইট ফ্যাং, ঠিক যেমন সূর্যালোকের পরশে পাপড়ি মেলে দেয় ফুল।

তবে ভালোবাসার আদিখ্যেতা দেখানো হোয়াইট ফ্যাং-এর সাধ্যের বাইরে। জীবনে কখনো কুকুরদের মতো ঘেউঘেউ করতে পারেনি সে। আজো পারে না। প্রভুকে দেখলে নেচে ওঠে তার মন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ছুটে কাছে যেতে পারে না। ব্যাপারটা ধাতেই নেই তার। তার দু'চোখে ফুটে ওঠে প্রচণ্ড ভালোবাসা, কিন্তু সেটা প্রকাশ করার জন্যে লাফালাফি করতে পারে না সে।

অবশ্য নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। ইতোমধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে, স্লেজের কুকুরগুলোর সাথে মারামারি করাটা তার প্রভু মোটেই পছন্দ করে না। তাই কুকুরগুলোকে ঘাঁটাতে যায় না সে। তবে প্রথম প্রথম তার শক্তির যে পরিচয় তারা পেয়েছে, তাতেই হোয়াইট ফ্যাংকে দেখার সাথেসাথে পথ ছেড়ে দেয় তারা।

একইভাবে ধীরে ধীরে ম্যাটকেও সহ্য করে নিলো সে। বুঝলো, ম্যাট তার প্রভুরই নিযুক্ত করা লোক। প্রভু নিজের হাতে তাকে খাওয়ায় না বললেই চলে। এই কাজটার ভার সে ছেড়ে দিয়েছে ম্যাটের ওপর। ফলে ম্যাটের হাতে খাবার একটা অভ্যেস গড়ে নিলো হোয়াইট ফ্যাং। ম্যাট একদিন স্লেজ টানাতে চাইলো তাকে, কিন্তু রাজি হয় না সে। শেষমেশ স্কট নিজহাতে লাগাম পরিয়ে দিতে আর আপত্তি করলো না হোয়াইট ফ্যাং। অন্য কুকুরগুলোকে নেতৃত্ব দিতে লাগলো, সেইসাথে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললো ম্যাটের প্রত্যেকটা নির্দেশ।

ম্যাকেঞ্জি অঞ্চলের স্লেজের সাথে অনেক পার্থক্য রয়েছে ক্লনডাইকের স্লেজের। অনেক পার্থক্য রয়েছে স্লেজ টানার মধ্যেও। এখানকার দল-

পতি সত্যিকারের দলপতি। সবচেয়ে শক্তিশালী কুকুরেরাই এখানে দলপতি হয়, এবং দলের সব কুকুর মেনে চলে তাকে। ভয় পায়। সারা-দিন স্লেজ টানার পরেও রাতে পাহারা দেয়ার কাজটা বাদ দিলো না হোয়াইট ফ্যাং। ফলে সে-ই হয়ে দাঁড়ালো তার প্রভুর সবচেয়ে মূল্য-বান কুকুর।

'আপনার বুদ্ধির কোনো তুলনা নেই,' হাসতে হাসতে একদিন বললো ম্যাট। 'এরকম একটা কুকুরের পক্ষে দেড়শো ডলার একেবারে পানির দাম। বিউটি স্মিথ আপনার ঘুসিতে যতোটা না আহত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আহত হয়েছে কুকুরটাকে বিক্রি করতে গিয়ে। সত্যি, এরকম ঠকা খুব কম লোকই ঠকে।'

বিউটি স্মিথের নাম শোনার সাথেসাথে দপ্ করে জ্বলে উঠলো উই-ডন স্কটের চোখ। বিড়বিড় করে সে বললো, 'শয়তান! শয়তান। পশুর সাথে কোনো পার্থক্যই নেই ওর।'

বসন্তকালের শেষদিকে আরেকটা বড়োসড়ো ঘটনা ঘটলো হোয়া-ইট ফ্যাং-এর। যে প্রভু তাকে এতো স্নেহ করতো, ভালোবাসতো, হঠাৎ করেই একদিন উধাও হয়ে গেলো সে। মালপত্র বাঁধাছাঁদার তোড়জোর দিয়ে এর একটা আভাস অবশ্য শুরু হয়েছিলো, কিন্তু হোয়া-ইট ফ্যাং অতোটা বুঝতে পারেনি। সে-রাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো সে, কিন্তু প্রভু এলো না। মাঝরাতের দিকে বইতে লাগলো হাড়কাঁপানো বাতাস। বাধ্য হয়ে কেবিনের পেছনে আশ্রয় নিলো সে। ঘুম ভালোমতো হলো না, পরিচিত সেই পদশব্দ শোনার জন্যে সজাগ হয়ে রইলো কান। রাত দু'টো পেরিয়ে যাবার পর ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। আরামের শয্যা ছেড়ে উঠে এলো সে, কেবিনের সিঁড়িতে বসেই কাটিয়ে দিলো বাকি রাতটুকু।

তবু প্রভু এলো না। সকালে কেবিনের ভেতর থেকে ম্যাট বেরিয়ে আসতেই করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে রইলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু সে যে কী জানতে চায়, ম্যাট কী করে বুঝবে। দিনের পর দিন কেটে গেলো, কিন্তু প্রভু ফিরলো না। যে হোয়াইট ফ্যাং জানতো না, অসুখ কি জিনিস, জীবনে প্রথমবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। শেষ মেষ অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে বাধ্য হয়ে তাকে কেবিনের ভেতরে নিয়ে এলো ম্যাট, সেইসাথে একটা চিঠি লিখলো তার মনিবকে।

সার্কল সিটিতে চিঠিটা গিয়ে পড়লো উইডন স্কটের হাতে। চিঠির ভাষা অনেকটা নিম্নরূপ :

'আপনার নেকড়েটাকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছি। কাজ করে না। খায় না। নড়াচড়ার শক্তিও প্রায় শেষ। ও বোধ হয় জানতে চায়, কেমন আছেন আপনি। কিন্তু ওকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। খুব সম্ভব আর কিছু দিনের মধ্যেই মারা যাবে ও।'

ম্যাটের কথায় কোনো অতিরঞ্জন নেই। খাওয়াদাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে হোয়াইট ফ্যাং। মনমরা অবস্থায় সারাদিন মেঝের ওপর পড়ে থাকে। অন্য কুকুরগুলো ইদানীং সুযোগ পেলেই কামড়ে দেয়, ফিরেও দেখে না হোয়াইট ফ্যাং। ম্যাট কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু নিষ্প্রভ চোখ তুলে বড়োজোর একবার তাকায় সে, তারপরেই আবার মাথা গুঁজে দেয় সামনের দুই পায়ের মধ্যে। শুধু খাবার নয়, জীবনের প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে হোয়াইট ফ্যাং।

এক রাতে বসে বিড়বিড় করে বই পড়ছিলো ম্যাট। হঠাৎ চাপা স্বরে গুঙিয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। তারপর উঠে দাঁড়ালো। কান খাড়া করে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে সে। খানিক পরেই একটা পদশব্দ শুনতে পেলো ম্যাট। প্রায় সাথেসাথেই ভেতরে ঢুকলো

উইন্ডন স্কট। ম্যাটের সাথে করমর্দন করলো সে, তারপর নজর বোলালো কেবিনের চারপাশে।

'নেকড়েটা কোথায়?' জানতে চাইলো সে।

কথাটা বলার প্রায় সাথেসাথেই হোয়াইট ফ্যাংকে দেখতে পেলো স্কট। চুপচাপ প্রভুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেচারি। কারণ অন্যান্য কুকুরের মতো ছুটে আসার অভ্যেস তার নেই।

'হায় ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাট। 'দেখুন, দেখুন, খুশিতে লেজ নাড়ছে ব্যাটা!'

নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উইন্ডন স্কট এগিয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। হোয়াইট ফ্যাং-ও এগিয়ে এলো প্রভুর সামনাসামনি। এতোদিন পর প্রভুর দেখা পেয়ে হকচকিয়ে গেছে সে। তাই বুঝে উঠতে পারছে না, এখন কী করা উচিত। অদ্ভুত একটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ, কিন্তু ভালোবাসার কথাটা সে প্রকাশ করতে পারছে না।

'আপনি যাবার পর ব্যাটা একবারও আমার দিকে ওভাবে তাকায়নি,' বললো ম্যাট।

কিন্তু কথাটা যেন শুনতেই পেলো না উইন্ডন স্কট। হাঁটু গেড়ে ইতোমধ্যে হোয়াইট ফ্যাং-এর পাশে বসে পড়েছে সে। আস্তে আস্তে ডলে দিচ্ছে কাঁধ, ঘাড় আর কানের গোড়া। প্রভুর হাতের ছোঁয়ায় শিহরণ জাগছে হোয়াইট ফ্যাং-এর শরীরে, নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে মৃদু গরগরানি।

তবে এতে মন ভরলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। ভালোবাসা ঠিক-মতো প্রকাশ করতে না পারার বোধটা কষ্ট দিতে লাগলো তাকে। হঠাৎ অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসলো সে। মাথাটা গুঁজে দিলো উইন্ডন

স্কটের বুকে। জীবনে এই প্রথম গরগরানি বন্ধ হয়ে গেছে। শরীরটা শুধু কাঁপতে লাগলো অসহ্য আবেগে।

অবাক হয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলো স্কট আর ম্যাট। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্কটের চোখজোড়া।

'হায় ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলো অভিভূত ম্যাট।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললো, 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম, ওটা নেকড়ে নয়—কুকুর। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কথাটা সত্যি না মিথ্যে!'

স্নেহময় প্রভুর সান্নিধ্য ফিরে পাবার পরপরই দ্রুত সেরে উঠতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। মাত্র দু'টো রাত আর একটা দিন কেবিনে কাটাবার পরেই বাইরে বেরিয়ে এলো সে। ইতোমধ্যে হোয়াইট ফ্যাং-এর শক্তির কথা ভুলেই গিয়েছিলো স্লেজটানা কুকুরগুলো। ফলে তাকে দেখামাত্রই একযোগে তেড়ে এলো সবাই।

'বাহ্! কাণ্ড দেখো,' কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলে উঠলো ম্যাট। 'শয়তানগুলো ভেবেছে, তুই বুঝি মরে গেছিস!—এমন শিক্ষা দিয়ে দে, যাতে অনেকদিন মনে থাকে!'

অবশ্য হোয়াইট ফ্যাংকে উৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। প্রভুকে ফিরে পাবার সাথেসাথে আবার সবকিছুই ফিরে পেয়েছে সে। শিরায় শিরায় আবার আগের মতোই বয়ে চলেছে প্রাণের জোয়ার। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে তাকে আবার করে তুলেছে অপরাজেয়। সুতরাং কুকুরগুলো তেড়ে আসার সাথেসাথে বিদ্যুদ্বেগে আঘাত হানলো সে। দেখতে দেখতে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সবাই। আঁধার নামার পর আবার একে একে এগিয়ে এলো প্রত্যেকটা কুকুর, মাথা নিচু করে মেনে নিলো হোয়াইট ফ্যাং-এর

কর্তৃত্ব।

সেদিনের পর থেকে উইডন স্কটের বুকে মাথা গুঁজে দেয়াটা তার অভ্যেসে পরিণত হলো। এটাই তার ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ। এর বেশি বোঝাবার ক্ষমতা তার নেই। জন্মের পর থেকে নিজের মাথা সম্বন্ধেই সে সবচেয়ে সচেতন। তাই মাথাটাকে অরক্ষিত রাখা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আঘাত পাবার ভয় থেকেই জন্ম হয়েছে এই সংস্কারের। অথচ সেই মাথাটাকেই সে সঁপে দিয়েছে উইডন স্কটের হাতে। প্রভুর ভালোবাসা তাকে দিয়েছে পরম নির্ভরতা। আর তাই নির্ভয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে পেরেছে সে।

এক রাতে শুতে যাবার আগে তাস খেলছিলো স্কট আর ম্যাট। হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এলো হিংস্র একটা গর্জন, আর প্রায় সাথে-সাথেই একটা মানুষের আর্তচিৎকার। এক মুহূর্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো দু'জনে, তারপরেই লাফিয়ে উঠলো হাতের তাস ফেলে।

'নেকড়েটা নিশ্চয় ধরেছে কাউকে,' বললো ম্যাট।

আবার ভেসে এলো আর্তচিৎকার। 'জলদি একটা আলো নিয়ে এসো!' কেবিন থেকে বেরোতে বেরোতে চেঁচিয়ে উঠলো স্কট।

ছুটে গিয়ে একটা বাতি নিয়ে এলো ম্যাট। সেই আলোয় দেখা গেলো একটা লোককে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বরফের ওপর। হাত দুটো এমনভাবে মুখ আর গলার একটা পাশ ঢেকে রেখেছে, যেন হোয়াইট ফ্যাং-এর কামড় থেকে গলাটাকে রক্ষা করতে চায় সে। অবশ্য এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিলো। কারণ গলার ওই অংশটার প্রতিই হোয়াইট ফ্যাং-এর চরম দুর্বলতা। লোকটার কাঁধ আর হাত-দু'টো ফালাফালা হয়ে গেছে হোয়াইট ফ্যাং-এর কামড়ে, কোটের হাতা আর নীল ফ্লানেলের জামাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝুলছে ন্যাকড়ার মতো।

স্কট ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর, গা জড়িয়ে ধরে টেনে সরিয়ে আনলো পেছনদিকে। ছাড়া পাবার জন্যে গজরাতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু কামড়াবার কোনোরকম চেষ্টা করলো না। কড়া ধমক লাগালো উইডন স্কট, মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেলো বিশাল কুকুরটা।

ম্যাট উঠতে সাহায্য করলো রক্তাক্ত লোকটাকে। কোনোমতে উঠে মুখের ওপর থেকে হাতটা সরাতেই চমকে উঠে নিজের হাতটা টেনে নিলো ম্যাট, ঠিক আগুনে হাত পড়লে মানুষ যেমন করে। সোজাসুজি তার দিকেই চেয়ে আছে বিউটি স্মিথ। দু'এক মুহূর্ত চোখ পিটপিট করার পরেই সে দেখতে পেলো হোয়াইট ফ্যাংকে, আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলো বীভৎস মুখটা।

হঠাৎ বরফের ওপর পড়ে থাকা দু'টো জিনিসের ওপর নজর পড়লো ম্যাটের। ইশারায় স্কটকেও দেখালো সে—কুকুর-বাঁধা ইস্পাতের শেকল আর ভারী গদা।

মাথা ঝাঁকালো উইডন স্কট। কিন্তু একটা কথাও বললো না। বিউটি স্মিথের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিলো ম্যাট। আর কিছু বলার প্রয়োজন পড়লো না। দ্রুতপায়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো সে।

ওদিকে আদর করতে করতে হোয়াইট ফ্যাং-এর সাথে কথা বলতে শুরু করেছে উইডন স্কট।

'তোকে চুরি করতে এসেছিলো, ভাই না রে?' কিন্তু তুই যেতে চাস না। ব্যাটা সে-কথা বুঝতে পারেনি, কি বলিস?'

'এখানে আবার আসার আগে হাজারবার ভেবে দেখবে শয়তানটা,' খিকখিক করে হেসে উঠলো ম্যাট।

ইতোমধ্যে অনেক শান্ত হয়ে এসেছে হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু চাপা গর্জনটা পুরোপুরি থেমে যায়নি।

একুশ

দূরের পথ

আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা গন্ধ। কোনো আভাস না পেলেও হোয়াইট ফ্যাং বুঝলো, গন্ধটা বিপদের। কেবিনের ভেতরে একবারও ঢোকেনি সে। তবু কেন যেন তার মন বলছে, বড়োসড়ো একটা পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে খুব শিগগিরই। আর তাই ইদানীং সে কেবিনের দরজা ছেড়ে নড়ে না বললেই চলে।

'ওই যে শুনুন, শুনছেন!' এক রাতে খেতে বসে ম্যাট বলে উঠলো তার মনিবের উদ্দেশে।

শুনতে পেয়েছে উইডন স্কট। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে হোয়াইট ফ্যাং। বেশ কিছুক্ষণ ফোঁপানোর পর যখন সে বুঝতে পারলো, প্রভু কেবিনের ভেতরেই আছে, এখনো তাকে ছেড়ে যায়নি, তখন চুপ করে গেলো সে।

'আমার যতোদূর মনে হয়, ওর চোখ এড়ানো খুব একটা সহজ হবে না,' বললো ম্যাট।

অসহায় চোখ তুলে তাকালো উইডন স্কট।

বললো, 'কিন্তু এই নেকড়েটাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে গিয়ে আমি কি করবো বলো দেখি ?'

'আমিও তো তা-ই ভাবছি,' জবাব দিলো ম্যাট। 'নেকড়েটাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে গিয়ে কী করবেন আপনি।'

ম্যাটের এই অস্পষ্ট জবাবে খুশি হলো না উইডন স্কট।

'শ্বেতাঙ্গদের কুকুরগুলো পাত্তাই পাবে না ওর কাছে,'

'ওকে দেখার সঙ্গেসঙ্গে তেড়ে আসবে তারা, আর মারা পড়বে এক। জরিমানা দিতে দিতে আমাকে যদি দেউলিয়া হয়, ওদের রোষ থেকে বাঁচাতে পারবো না কুকুরটাকে।'

'হ্যাঁ, ও একেবারে জাত খুনে,' বললো ম্যাট।

সন্দেহভরা চোখে ম্যাটের দিকে তাকালো উইডন স্কট।

দৃঢ় গলায় বললো, 'একসময় হয়তো তা-ই ছিলো, কিন্তু এখন আর ওকে কোনোভাবেই খুনে বলা চলে না।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করলো ম্যাট। 'কিন্তু ওর ওপর নজর রাখার জন্যে একজন লোক আপনাকে রাখতেই হবে।'

কথাটা মনে ধরলো স্কটের। আনন্দিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে। ঠিক এই সময় দরজার ওপাশ থেকে আবার ভেসে এলো ফোঁপানির শব্দ।

'অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কুকুরটা সত্যিই আপনার কথা খুব ভাবে,' বললো ম্যাট।

চোখ গরম করে তাকালো স্কট। 'বেশি বাজে বকো না। নিজের মনের খবর আমি খুব ভালোই রাখি ! আর কী করবো, সে-ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি !'

'আমিও আপনার সাথে একমত, তবু···

'শুধু কী ?' চেঁচিয়ে উঠলো স্কট।

'শুধু...' নরম গলায় কথা শুরু করে পরে একটু গলা চড়ালো ম্যাট। 'আমার মনে হয়, এ-ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি না করাই ভালো। আপনার কথা শুনলে যে-কেউ বুঝবে, মনের খবর আপনি রাখেন না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন কথাটা যাচাই করে নিলো উইডন স্কট। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো, ম্যাট। নিজের মনের খবরই আমি রাখি না, আর মুশকিলটা সেখানেই।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উইডন স্কট বললো, 'কুকুরটাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে যাওয়াও একটা চরম হাস্যকর ব্যাপার হবে।'

'আমিও আপনার সাথে একমত,' বললো ম্যাট। এবারেও তার জবাবে খুশি হতে পারলো না স্কট।

'কিন্তু ব্যাটা আপনার যাবার কথা টের পেলো কী করে, সেটা ভেবেই তাজ্জব লাগছে,' খানিক পর আবার বললো ম্যাট।

'এর জবাব আমারও জানা নেই, ম্যাট,' বেদনাহত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো স্কট।

অবশেষে এসে গেলো সেই বিশেষ দিন। হোয়াইট ফ্যাং দেখলো, অনেক মালপত্র গোছগাছ করে রাখা হয়েছে কেবিনের মেঝেতে। লোকজনের আনাগোনাও বেড়ে গেছে আজ। হ্যাঁ, এই বিপদের গন্ধটাই পেয়েছিল সে। যাত্রার আয়োজন করছে তার প্রভু। এর আগে প্রভু তাকে ছেড়ে গিয়েছিলো, সুতরাং এবারেও নিশ্চয় ছেড়ে যাবে।

সে-রাতে হোয়াইট ফ্যাং আর্তনাদ করলো নেকড়েদের মতো। ঠিক এমনি আর্তনাদ সে করেছিলো ছোটবেলায়, যখন বন থেকে ফিরে এসে দেখেছিলো, তাঁবু তুলে চলে গেছে গ্রে বীভার। অনেক আগের সেই রাতটির মতো আজও সে নাক তুললো আকাশের দিকে, তারপর

করুণ সুরে নিজের দুঃখের গল্পটা শুনিয়ে দিলো রাতের নক্ষত্রদিকে।

কেবিনের ভেতর তখন সবে শুয়ে পড়েছে দু'জন মানুষ।

'কুকুরটা আবার খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে,' নিজের বা জানালো ম্যাট।

কোনো জবাব দিলো না উইডন স্কট, শুধু খসখস করে উঠলো কম্বল।

'আগেরবার যেরকম দেখেছি, তাতে মনে হয়, এবার তা বাঁচানো যাবে না।'

আরো জোরে খসখস করে উঠলো উইডন স্কটের কম্বল।

'চুপ করো!' অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো তার চিৎকার। 'মেয়েরাও তোমার মতো প্যানপ্যান করে না।'

'আমিও আপনার সাথে একমত,' বললো ম্যা [illegible] পারলো না, ও [illegible] কটা ঠাট্টা করছে কিনা।

পরদিন আরো অস্থির হয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। এক [illegible] অন্যেও প্রভুর কাছ থেকে সরলো না সে। স্কট যেখানেই গেলো সে-ও গেলো পেছনে পেছনে, আর যখন কেবিনের ভেতরে থাক [illegible] পটাপ বসে রইলো সে সামনের সিঁড়ির ওপর। আরো মালপ [illegible] হলো। ছোট্ট একটা তেরপলে প্রভুর কম্বল আর [illegible] শাক-গুলো গুছিয়ে দিলো ম্যাট। তাকিয়ে তাকিয়ে সব [illegible] হোয়াইট ফ্যাং।

কিছুক্ষণ পরে এলো দু'জন ইণ্ডিয়ান। তারা [illegible] স্কটের পেছনে পেছনে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো, তীক্ষ্ণচোখে নজর রাখলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু তাদের অনুসরণ করলো না। কারণ প্রভু এখনো ভেতরেই আছে। খানিক পরেই ফিরে এলো ম্যাট। [illegible] ঠিক তখনই

প্রভু এসে দাঁড়ালো দরজায়, হোয়াইট ফ্যাংকে ডেকে নিয়ে গেলো ভেতরে।

'বেচারি,' হোয়াইট ফ্যাং-এর কানের পেছনটা ডলতে শুরু করলো স্কট, টোকা দিতে লাগলো মেরুদণ্ডে। 'আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হচ্ছে রে। এতো দূরে যে, তুই যেতে পারবি না। তাই গর্জে ওঠ আর একবার—শেষবারের মতো ছাড় একটা বিদায়ের গর্জন।'

কিন্তু গর্জে উঠলো না হোয়াইট ফ্যাং। করুণচোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর মাথাটা গুঁজে দিলো প্রভুর বুকে।

'ওই যে বাজছে।' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাট। ইউকন থেকে ভেসে আসছে একটা জাহাজের বাঁশির কর্কশ শব্দ। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন। সামনের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করবেন। আমি পেছনদিক দিয়ে বেরোচ্ছি। উঠে পড়ুন।'

দড়াম করে একইসাথে বন্ধ হলো দু'দিকের দরজা। বাইরে দাঁড়িয়ে ম্যাটের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো স্কট। কেবিনের ভেতর থেকে ভেসে এলো কোঁপানি আর দীর্ঘশ্বাস।

'সব সময় ওর ওপর নজর রেখো, ম্যাট,' পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে বললো স্কট। 'কেমন থাকে, কী করে, অবশ্যই চিঠি লিখে জানাবে।'

'নিশ্চয়,' বললো ম্যাট। 'কিন্তু কুকুরটা কেমন কাঁদছে, শুনতে পাচ্ছেন!'

দু'জনেই থামলো। হোয়াইট ফ্যাং এখন এমন এক সুরে কাঁদছে, ঠিক কুকুরেরা যেমন কাঁদে তাদের প্রভু মারা গেলে। অত্যন্ত করুণ সেই সুর একেবারে খাদ থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে যাচ্ছে চড়ায়, যেন ধীরে ধীরে নির্মাণ করছে এক বেদনার স্তূপ।

এ-বছর এই প্রথম একটা জাহাজ এখান থেকে রওনা দিচ্ছে বাইরের জগতের উদ্দেশে। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীর ভিড় খুব বেশি। সোনার সন্ধানে যারা এসেছিলো, তাদের কেউ কেউ সফল হয়েছে, ব্যর্থই হয়েছে বেশির ভাগ। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে উৎসাহের কমতি নেই কারো। স্কট শেষবারের মতো করমর্দন করছিলো ম্যাটের সঙ্গে, এমন সময় পেছনে তাকাতেই অসাড় হয়ে গেলো ম্যাটের হাত। ঘুরে দাঁড়ালো স্কট। বেশ কিছুটা দূরে হলেও, তার দিকেই চেয়ে ডেকের ওপর বসে আছে হোয়াইট ফ্যাং।

'সামনের দরজাটা বন্ধ করেছিলেন তো?' জানতে চাইলো ম্যাট।

মাথা ঝাঁকালো স্কট। বললো, 'আর পেছনেরটা?'

'ভালোভাবে বন্ধ করে এসেছি।'

অনুগ্রহ লাভের আশায় মুখটা করুণ হয়ে উঠেছে হোয়াইট ফ্যাং-এর, কিন্তু এগিয়ে আসার কোনোরকম চেষ্টা করছে না সে।

'যাই, ওকে আবার তীরে নিয়ে যেতে হবে।'

পা বাড়ালো ম্যাট, কিন্তু কাছে যাবার আগেই উঠে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। সারা ডেক জুড়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো সে, সব সময় রয়ে গেলো ম্যাটের নাগালের বাইরে।

কিন্তু স্কট ডাকতেই ছুটে এলো হোয়াইট ফ্যাং।

'এতোদিন ধরে খাওয়াচ্ছি, অথচ যেন চিনতেই পারছে না ব্যাটা,' ক্ষুব্ধস্বরে বললো ম্যাট। 'অথচ শুধু প্রথম দু'একদিন পাইয়েছেন আপনি, সেটা ঠিক মনে আছে। আসল প্রভু কে, তা বুঝতে মোটেই ভুল করেনি ব্যাটা!'

হোয়াইট ফ্যাং-এর পিঠ চাপড়াচ্ছিলো স্কট। হঠাৎ তার নজর পড়লো কুকুরটার নাক আর দু'চোখের মাঝখানের দু'টো টাটকা ক্ষতের

ওপর।

ম্যাট নিচু হয়ে হোয়াইট ক্যাং-এর পেটের নিচদিকটা পরীক্ষা করলো ভালো করে।

'জানালার কথা একেবারেই মনে ছিলো না আমাদের। নিশ্চয় ওগুলোরই কোনো একটার কাচ ভেঙে পালিয়েছে।'

কিন্তু ম্যাটের কথা শুনতে পেলো না স্কট। চিন্তার ঝড় চলছে তার মাথার মধ্যে। শেষবারের মতো বাঁশি বাজালো জাহাজটা। গলা থেকে রুমাল খুলে হোয়াইট ক্যাং-এর গলায় পরিয়ে দিতে গেলো ম্যাট, ঠিক এই সময় হঠাৎ তার একটা হাত চেপে ধরলো স্কট।

'থাক, ম্যাট। নেকড়েটার কথা—তোমাকে আর লিখতে হবে না। বুঝতেই পারছো, মানে আমি…'

'কী বলছেন আপনি!' চিৎকার করে উঠলো ম্যাট। 'আপনি কি বলতে চান…?'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছো, তা-ই বলতে চাই আমি। এই রইলো রুমাল। আমিই বরং ওর খবর জানিয়ে দেবো তোমাকে।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে খুলে ফেললো ম্যাট।

'ওর লোমগুলো ভেঁটে দেবেন না!' চিৎকার করে বললো সে। 'নইলে ওখানকার আবহাওয়া সইতে পারবে না।'

সাড়া দিলো জাহাজ। শেষবারের মতো ম্যাটের উদ্দেশে নাড়লো স্কট। তারপর ঝুঁকে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর।

মাথায় চাপড় মারতে মারতে বললো, 'এবার গর্জে ওঠ। দেখি, কতো জোরে গর্জন ছাড়তে পারিস তুই।'

বাইশ

দক্ষিণের দেশ

জাহাজ এসে ভিড়লো সানফ্রান্সিসকোতে। রাস্তায় পা দিয়েই বোকা বনে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। এতোদিন পর্যন্ত শুধু কাঠের তৈরি কেবিন দেখে এসেছে সে। কিন্তু এখানকার দালানগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। আর রাস্তাতেও যে কতো রকমের বিপদ! একের পর এক ছুটে চলেছে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি। সেগুলোর অবিরাম চিৎকার বুনো লিংক্সের গর্জনের চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর নয়।

এখানে যা-কিছু চোখে পড়ছে, সবই শক্তির প্রতীক। আর এসব শক্তির পেছনে আছে মানুষের হাত। শাদা ঈশ্বরদের শক্তির পরিচয় সে অনেক আগেই পেয়েছে। কিন্তু সে-শক্তি যে এতো অসীম, কল্পনাও করেনি হোয়াইট ফ্যাং। একেবারে বাচ্চা বয়সে গ্রে বীভারের তাঁবু দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলো সে, তুচ্ছ মনে করেছিলো নিজেকে। আজ এতো বড়ো হওয়া সত্ত্বেও ওই একইরকম ভয় পেলো সে, বিস্ময়কর এই শক্তির তুলনায় নিজেকে মনে হলো নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। আর এতো ঈশ্বরও আছে পৃথিবীতে! মাথা ঘুরতে লাগলো তার।

ওদিকে রাস্তা থেকে ভেসে আসা বিরামহীন শব্দ অবশ করে ফেলতে চাইছে স্নায়ু। জীবনে কখনো এতো অসহায় বোধ হয়নি। প্রভুর পায়ে পায়ে হেঁটে চললো সে। এখন প্রভুকে হারিয়ে ফেললে কী দশা হবে, কথাটা ভাবতেও আতঙ্ক জাগলো তার।

তবে এই আতঙ্ক তাকে একরাতের বেশি সইতে হলো না। পর-দিনই তাকে তোলা হলো একটা ট্রাকে, শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো গাদা করা মালপত্রের মাঝখানে।

আর এখানেই তাকে ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেলো প্রভু। মনটা খারাপ হয়ে গেলো তার, কিন্তু একটু পরেই নাকে ভেসে এলো পরি-চিত ক্যানভাসের গন্ধ। প্রভু তাহলে চলে যায়নি; সুতরাং প্রভু যতো-ক্ষণ ফিরে না আসে, তার মালপত্রগুলো পাহারা দেয়া যাক, খুশিমনে ভাবলো হোয়াইট ফ্যাং।

'ঠিক সময়ে এসেছেন আপনি,' উইডন স্কট ফিরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলো ট্রাকের ড্রাইভার। 'কুকুরটা আপনার মালপত্রগুলো ছুঁতে পর্যন্ত দেয়নি।'

ট্রাক থেকে নেমেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। ঊধাও হয়ে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের শহর। চারপাশে এখন শুধু সবুজের সমারোহ। তবে বিস্ময়ের ভাবটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ মানুষ-প্রভুদের কাছে 'অ গ' বলে কোনো জিনিস নেই। তাদের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলো সামনে। হাত বাড়িয়ে প্রভুর গলা জড়িয়ে ধরলো ভদ্রমহিলা। তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরলো উইডন স্কট।

'ভয় পাবার কিছু নেই, ।,' বললো সে। ' । টা ভেবেছে, তুমি

বুঝি আমাকে মারতে চাইছো। ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। শিগগিরই সবকিছু শিখে নেবে ও।'

'আর শিখে না নেয়া পর্যন্ত ছেলেকে আদর করতেও পারবো আমি,' হাসলো মহিলা, কিন্তু মুখটা এখনো ফ্যাকাসে হয়ে আছে।

এবার ভালো করে হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে তাকালো মহিলা। দাঁত বের করে শয়তানের মতো চোখ পাকাচ্ছে কুকুরটা।

'শিগগিরই সবকিছু শিখে নেবে ও,' আবার বললো স্কট। তারপর নরম গলায় কথা বলে বলে শান্ত করলো কুকুরটাকে। কিন্তু কুকুরটা শান্ত হয়ে পড়তেই চড়ে গেলো তার স্বর।

'চুপচাপ শুয়ে পড়! একদম নড়াচড়া করবি না!'

এই জিনিসটা তাকে সদ্য শিখিয়েছে প্রভু। ধমক দেয়ার সাথেসাথে শুয়ে পড়তে হবে।

'মা, এসো।'

হাত বাড়িয়ে দিলো সে, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর থেকে চোখ সরালো না।

'আবার মাথা তোলে!' ধমকে উঠলো সে। 'শুয়ে পড়!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। আবার প্রভুর গলা জড়িয়ে ধরলো মহিলা। কিন্তু তাতে প্রভুর কোনো ক্ষতি হলো না। এবারে মালপত্রগুলো তোলা হলো একটা ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর অন্য দুই ঈশ্বরের সাথে প্রভুও গিয়ে বসলো গাড়িতে। চলতে শুরু করলো গাড়ি। হোয়াইট ফ্যাংও ছুটতে শুরু করলো পেছনে পেছনে। বলা যায় না, ঘোড়াগুলো প্রভুর ক্ষতি করতে পারে।

মিনিট পনেরো পরেই গাড়িটা ঢুকে পড়লো পাথরের তৈরি একটা দরজার ভেতরে। দু'পাশে আখরোট গাছের লম্বা সারি। মাঝেমধ্যে

দু'চারটে ওক। য়গাটা যেমন সবুজ ঘাসে ভরা, সামনের দৃশ্য ঠিক তার উল্টো। প্রান্তর ভরে আছে সোনালি রঙের খড়ে। প্রান্তরের একেবারে শেষ মাথায় টিলার ওপরে দেখা গেলো অসংখ্য জানালা-অলা একটা বাড়ি।

তবে দৃশ্যগুলো ভালোভাবে দেখার সুযোগই পেলো না হোয়াইট ফ্যাং। হঠাৎ তার দিকে তেড়ে এলো একটা শীপ-ডগ। চোখের পলকে পিঠের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেলো তার। প্রভুর ক্ষতি করতে চায়, এতোবড়ো সাহস! কিন্তু আঘাত হানার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। আরে, ছিঃ! এটা তো মাদি। আর যা-ই হোক, কোনো মাদিকে আঘাত হানার মতো হীন কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু শীপ-ডগটার এসব চিন্তার বালাই নেই। ভেড়া পাহারা দিতে দিতে বুনো জানোয়ারের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছে তার। বিশেষ করে সে-জানোয়ারের চেহারা যদি হয় নেকড়ের মতো, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। কারণ নেকড়ের চেয়ে বড়ো শত্রু ভেড়াদের আর নেই। নিজের কাঁধে তীক্ষ্ণ দাঁতের খোঁচা অনুভব করলো হোয়াইট ফ্যাং। আঘাত না করে পাশ কাটাতে চাইলো সে, কিন্তু বার-বার পথরোধ করে দাঁড়ালো মাদি কুকুরটা।

'এই কলি, এদিকে আয়!' বললো একজন ঈশ্বর।

উইডন স্কট হাসলো।

'চিন্তার কিছু নেই, বাবা। আরো অনেক কিছু শিখে নেবে ও। সবে তো শিখতে শুরু করেছে। তবে তুমি দেখো, খুব বেশি সময় ও নেবে না।'

এখনো পথ ছাড়তে চাইছে না মাদি কুকুরটা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি

খেলে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর মাথায়। কাঁধ দিয়ে মাদিটাকে ধাক্কা মারলো সে। শুধু ছিটকেই পড়লো না কুকুরটা, ডিগবাজিও খেলো কয়েকবার।

এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না হোয়াইট ফ্যাং। পথের বাধা দূর হবার সাথেসাথে সে ছুটে চললো স্বচ্ছন্দ গতিতে। ওদিকে সামলে নিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছে মাদিটা। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং এবার তাকে দেখিয়ে দিলো, প্রকৃত দৌড় কাকে বলে।

গাড়িটার প্রায় সাথেসাথেই সে এসে পৌঁছুলো বাড়িটার সামনে। প্রভু কেবল গাড়ি থেকে নামছে, হঠাৎ একটা বিপদের গন্ধ পেলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু বিপদটার মুখোমুখি হবার আগেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা ডিয়ার-হাউণ্ড। কাঁধের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো সে। তৎক্ষণাৎ দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো মাথার ভেতরে। চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। খাড়া হয়ে গেছে সমস্ত লোম, ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁট পেছনে সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে সাদা দাঁত।

সম্ভবত সেই মুহূর্তেই মারা পড়তো ডিয়ার-হাউণ্ডটা। কিন্তু একেবারে সময়মতো এসে হাজির হলো কলি। এবারে তার ধাক্কায় একই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো ছিটকে পড়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

আবার উঠে পড়ার আগেই ছুটে এসে তাকে শক্ত করে চেপে ধরলো উইণ্ডন স্কট।

'অভ্যর্থনাটা ভালোই হলো ওর,' হোয়াইট ফ্যাং-এর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো সে। 'জীবনে মাত্র একবারই পড়ে গেছে ও, অথচ আজ পড়ে গেলো দু'দু'বার।'

ঘোড়ার গাড়িটা ফিরে যাবার প্রায় সাথেসাথেই অচেনা একদল

ঈশ্বর বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। তাদের কেউ কেউ দূরত্ব বজায় রাখলো ; কিন্তু দু'জন মহিলা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো প্রভুর গলা। এবারে আর তেমন রাগ হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরা প্রভুর কোনো ক্ষতি করতে চায় না। এদের কথা-বার্তায় মধ্যেও সেরকম বিপজ্জনক কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। দু'একজন ঈশ্বর এগিয়ে আসতে চাইলো তার কাছে। কিন্তু গর্জে উঠে সে জানিয়ে দিলো, ব্যাপারটা মোটেই পছন্দসই নয়। তারপর গুটিগুটি পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্রভুর গা ঘেঁষে।

ইতোমধ্যে নির্দেশ পেয়ে গাড়িবারান্দার একপাশে শুয়ে পড়েছে ডিয়ার-হাউণ্ডটা। কিন্তু তার খলন্তদৃষ্টি হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে নিবদ্ধ। ওদিকে কলিটাকে জড়িয়ে ধরেছে একজন মহিলা, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না। হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছে মাদি কুকুরটা। যেন ভাবতেও পারছে না, একটা নেকড়ের উপস্থিতি প্রভুরা মেনে নিচ্ছে কীভাবে!

সকলে এবার রওনা দিলো বাড়ির ভেতরে। হোয়াইট ফ্যাং এগোতে লাগলো প্রভুর পেছনে পেছনে। গাড়িবারান্দা থেকে গর্জে উঠলো ডিক, সাথেসাথে পাল্টা গর্জন ছাড়লো হোয়াইট ফ্যাং।

'কলিটাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে এই দু'টোকে বাইরে রাখা হোক,' বললো স্কটের বাবা। 'প্রাণ ভরে লড়াই করুক ব্যাটারা। তারপর বন্ধু হয়ে যাক।'

'হ্যাঁ, বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ডিকের মৃত্যুতে শোকটাও শেষমেষ একেই পালন করতে হবে,' হাসলো স্কট।

অবিশ্বাসের চোখে স্কটের বাবা প্রথমে তাকালো হোয়াইট ফ্যাং-দিকে, তারপর ডিকের দিকে, সবশেষে পুত্রের দিকে।

'তার মানে তুমি বলতে চাও···

মাথা ঝাঁকালো উইডন। 'হ্যাঁ।   ।। এর কি বড়োজোর দু'মিনি-টের মধ্যেই খতম হয়ে যাবে ডিক।'

এবারে সে ঘুরলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। 'এই, নেকড়ে। চল্‌, ভেতরে চল্‌।'

বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো হোয়াইট ফ্যাং। পাশ থেকে যে-কোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ডিক। তাছাড়া নতুন জায়গা, অজানা শত্রুরও নিশ্চয় অভাব নেই। কিন্তু বাড়ির একেবারে ভেতরে যাবার পরেও কেউ লাফিয়ে পড়লো না ওর ঘাড়ে। ফলে খুশিমনে মৃদু একটা গর্জন ছেড়ে গুটিসুটি মেরে প্রভুর পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। তবে এ-অবস্থাতেও সে পূর্ণ সচেতন। ওত পাতা কোনো শত্রুর উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে সে চোখের পলকে।

তেইশ

প্রভুর রাজ্য

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে শুধু খাপ খাইয়ে নিতেই শেখেনি হোয়াইট ফ্যাং, নানা জায়গা ঘোরার ফলে এটাও বুঝতে পেরেছে যে, এই খাপ খাইয়ে নেয়াটা কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুর বাবা, বিচারপতি স্কট যে-বাড়িটা তৈরি করেছে, সেটার নাম—সিয়েরা ভিস্তা। এখানে আসার পর খুব দ্রুত এখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে হোয়াইট ফ্যাং। কুকুরদু'টোর সাথেও বড়ো ধরনের কোনো গণ্ডগোল হয়নি। ওদিকে কলি আর ডিকও বুঝতে পেরেছে যে, হোয়াইট ফ্যাং নেকড়ে হোক আর যা-ই হোক, প্রভুরা যাকে আশ্রয় দিতে চায়, তাকে মেনে নেয়া ছাড়া গতি নেই।

অবশ্য প্রথম প্রথম ডিক ওকে কামড়ানোর সুযোগ খুঁজেছে, কিন্তু সে-চেষ্টা করে যে কোনো লাভ হবে না, এই সত্যটা উপলব্ধি করতেও খুব বেশি দেরি হয়নি। ওরা দু'জন ভালো বন্ধু হতে পারতো, কিন্তু বন্ধুত্ব জিনিসটা হোয়াইট ফ্যাং-এর ধাতেই নেই। সারাজীবন একা থাকতে চেয়েছে সে। এখনো তা-ই চায়। এরপরেও গায়ে পড়ে দু'-

একবার বন্ধুত্ব পাতাতে গেছে ডিক, কিন্তু সুবিধে হয়নি। অবশ্য প্রভুর কুকুরকে যে জখম করা চলবে না, সেই শিক্ষা হোয়াইট ফ্যাং এখনো ভোলেনি। কিন্তু তাই বলে নিজের একাকিত্বকে তো আর বিসর্জন দেয়া যায় না।

তবে এসবের ধার ধারলো না কলি। তার চোখে হোয়াইট ফ্যাং শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়। প্রভুদের ইচ্ছেমুসারে নেকড়েটার উপস্থিতি সে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু শত্রুতার কথাটা ভুলতে পারেনি।

তাছাড়া কলি লক্ষ্য করেছে, হোয়াইট ফ্যাং তাকে আক্রমণ করতে চায় না। তাই সুযোগ পেলেই নেকড়েটাকে কামড়াতে ছাড়ে না সে। যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে তাকে হোয়াইট ফ্যাং। কাঁধে কামড় দিলেও এমন অবিচল ভঙ্গিতে হেঁটে যায়, যেন খেয়ালই করেনি ব্যাপারটা। কিন্তু পেছনের পায়ে কামড় দিলে আর গাম্ভীর্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তখন পালাতে হয় লেজ গুটিয়ে।

আরো অনেককিছু শিখে নিতে হলো হোয়াইট ফ্যাংকে। উত্তরের জীবন ছিলো সহজ-সরল। কিন্তু ভীষণ জটিল সিয়েরা ভিস্তার জীবন। সবচেয়ে আগে চিনতে হবে প্রভুর পরিবারকে। মিট-শা আর ক্লু-কুচ যেমন গ্রে বীভারের আশ্রয়ে বাঁচতো, এখানকার সবাই তেমনি প্রভুর ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু সিয়েরা ভিস্তা গ্রে বীভারের তাঁবুর মতো ছোট নয়। এখানে মানুষও অনেক। আছে বিচারপতি স্কট আর তার স্ত্রী। আছে প্রভুর দুই বোন—বেথ আর মেরী। এরপরেও আছে প্রভুর স্ত্রী অ্যালিস এবং তাদের চার ও ছ'বছর বয়সের দুই ছেলেমেয়ে—উইডন আর মড। এরা যে প্রভুর আপনজন, এ-কথা তাকে কেউ বলে দেয়নি। এতো-গুলো মানুষকে চিনে রাখাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবু চেষ্টা করছে হোয়াইট ফ্যাং

হোয়াইট ফ্যাং, যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সবাইকে চেনার।

সবচেয়ে মুশকিল হলো দুই শিশুকে নিয়ে। সারাজীবন সে এদের ঘৃণা করে এসেছে। তাই প্রথম যেদিন উইডন আর মড এগিয়ে এলো তার দিকে, গর্জে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু প্রভুর হু'ডের এক চড় খেয়ে বুঝলো, ওরকম করা চলবে না। পরে সে লক্ষ্য করেছে, শিশু দু'টোকে প্রভু খুবই ভালোবাসে। আর তাই সেদিনের পরে তাদের ইচ্ছের কখনোই বাধা দেয়নি।

তবে শিশুদের আদর মোটেই ভালো লাগে না তার। উইডন আর মড যখন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুপচাপ পড়ে থাকে সে, ঠিক যেমন সার্জনের ছুরির নিচে পড়ে থাকে রোগী। কখনো কখনো সে-আদর একেবারে অসহ্য লাগলে উঠে চলে যায় হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু ধীরে ধীরে একসময় শিশুদেরও পছন্দ করতে শুরু করলো সে। খেলতে লাগলো তাদের সাথে। তবে আগের মতোই নিজে থেকে কিছু করতে গেলো না। তারা খেলতে এলে খেললো, না এলে বসে রইলো চুপ করে।

বিচারপতি স্কটকেও পছন্দ করে সে। সকালে বারান্দায় বসে বুড়ো যখন খবরের কাগজ পড়ে, পায়ের কাছে বসে থাকে হোয়াইট ফ্যাং। মাঝেমধ্যে দু'একটা কথা বলে বুড়ো, কিংবা চোখ তুলে তাকায়, বেশ লাগে তার। তবে এসব সে করে কেবল প্রভুর অনুপস্থিতিতে। প্রভু আসার সাথেসাথে আর কারো কথা মনে থাকে না তার।

পরিবারের সবাইকে এখন আদর করতে দেয় সে। কিন্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে আদর গ্রহণ করার ভেতরে, যা শুধু তার প্রভুই বোঝে। একমাত্র প্রভু গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই গরগর শব্দ বেরিয়ে আসে তার গলা থেকে।

পরিবারের লোকজন আর ভৃত্য-পরিচারকের মধ্যে যে একটা পার্থক্য রয়েছে, সেটা বুঝতেও মোটেই দেরি হয়নি তার। সে জানে, তার মতোই ওরাও প্রভুর অধীন। প্রভুর জন্যে রান্না করে ওরা, বাসন-কোসন মেজে দেয়, ঠিক যেমন করে ম্যাট। সুতরাং এদের খুব একটা তোয়াক্কা না করলেও চলে।

বাড়ির বাইরেও ছড়িয়ে আছে শেখার মতো অনেক কিছু। রাজ্যটা বেশ বড়ো, কিন্তু তারও একটা সীমানা আছে।

রাস্তাগুলো ঈশ্বরদের সাধারণ সম্পত্তি, সবাই ব্যবহার করে। রাস্তার দু'পাশে ঈশ্বরদের নতুন নতুন বাড়ি। সেগুলোতে অচেনা সব কুকুর। মুশকিল হলো, ঈশ্বরদের ভাষা বোঝে না শেখার শিখে নিতে হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে।

তবে প্রভুর হাতের চড় আর তার ধমককেই সে যাবতীয় শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। প্রভুর হাতের মৃদু চড় তাকে এতো বেশি ব্যথা দেয়, যার তুলনায় গ্রে বীভার কিংবা বিউটি স্মিথের মার নিতান্তই তুচ্ছ। কারণ, ওরা শুধু তার শরীরে আঘাত দিয়েছে, হৃদয়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

অবশ্য চড় তাকে খেতে হয় না বললেই চলে। একটা কাজ উচিত না অনুচিত, প্রভুর গলা শুনলেই বুঝতে পারে সে। জীবনের নতুন একটা তীরে পৌঁছনোর ব্যাপারে গলার এই ওঠানামা কাজ করে কম্পাসের মতো।

উত্তরের বরফের রাজ্যে কুকুরই একমাত্র গৃহপালিত জন্তু। বাদবাকি সবই বুনো। ফলে তাদের শিকার করতে কোনো বাধা নেই। সারা-জীবন যথেচ্ছ শিকার করেছে হোয়াইট ফ্যাং। তাই এ-কথাটা তার মাথায় একবারও ঢোকেনি যে, সান্তা ক্লারা উপত্যকায় এই অভি

সাধারণ নিয়মটার ব্যতিক্রম থাকতে পারে। একদিন ভোরে বাড়ির সামনে পায়চারি করতে করতে একটা মুরগি দেখতে পেলো হোয়াইট ফ্যাং। এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটার ওপর। মুরগিটা কার্মের, বেশ মোটাতাজা আর সুস্বাদু। চেটেপুটে খেয়ে গাল চাটতে চাটতে হোয়াইট ফ্যাং ভাবলো, মাঝেসাঝে এ-ধরনের শিকার পেলে মন্দ হয় না।

সেদিনই আস্তাবলের কাছে আরেকটা মুরগি দেখতে পেয়ে ছুটে গেলো সে। চাবুক হাতে এক সহিস দৌড়ে এলো মুরগিটাকে বাঁচাতে। সপাং করে গায়ে একটা চাবুক পড়তেই মুরগি ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। সহিসটা ভাবতেও পারেনি, চাবুক দিয়ে এই কুকুরকে আটকানো যাবে না। তাই দ্বিতীয়বার চাবুক চালালো সে। তৎক্ষণাৎ টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো হোয়াইট ফ্যাং। ছিটকে দূরে চলে গেলো চাবুক, দু'হাতে গলা ঢেকে সহিস চেঁচিয়ে উঠলো—'বাঁচাও! বাঁচাও!' কোনোমতে বেচারির গলাটা বাঁচলো বটে, কিন্তু কালাকালা হয়ে গেলো দুই হাত।

ভীষণ ঘাবড়ে গেলো সহিস। বাড়ির দিকে পালিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করলো সে। চেষ্টাটা সফল হতো না, যদি না ঠিক সময়মতো এসে হাজির হতো কলি। সোজা ছুটে এসে হোয়াইট ফ্যাং-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে, ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগলো আঁচড়ে-কামড়ে।

এই সুযোগে পালিয়ে গেলো সহিসটা। দু'এক মিনিট কলির আক্রমণ এড়ানোর চেষ্টা করলো হোয়াইট ফ্যাং কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে পালিয়ে গেলো সে-ও।

'মুরগি মারার অভ্যেসটা ওকে ছাড়াতে হবে,' সব শুনে বললো স্কট। 'কিন্তু ব্যাপারটা আগে নিজের চোখে দেখা দরকার।'

দু'রাত পরেই ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে পেলো স্কট। তবে ব্যাপারটা যে এতো ব্যাপক আকারে ঘটবে, ভাবতেও পারেনি সে। ইতোমধ্যে মুরগির ঘরটা ভালোভাবে চিনে নিয়েছিলো হোয়াইট ফ্যাং। রাতের বেলা চুপিসারে সেই ঘরে গিয়ে পৌঁছুলো সে। আর তার পরেই শুরু হলো পাইকারি হত্যা।

সকালে বারান্দায় বসে ছিলো স্কট, এমন সময় সহিস এসে পঞ্চাশটা লেগহর্নের বাচ্চা শুইয়ে রাখলো তার সামনে। মরা বাচ্চাগুলো দেখে কোনো অপরাধবোধ তো জাগলোই না, বরং নিজের মহৎ কর্মের জন্যে বুকটা ফুলে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো স্কট, তারপর প্রচণ্ড ধমক লাগালো হোয়াইট ফ্যাংকে। মরা বাচ্চাগুলোর ওপর অপরাধীর নাক চেপে ধরলো সে, সেইসাথে চড়ও লাগালো বেশ কয়েকটা।

এরপর আর কখনোই মুরগির ওপর চড়াও হয়নি হোয়াইট ফ্যাং। ব্যাপারটা যে আইনবিরুদ্ধ, প্রভুর ধমক শুনেই বুঝে নিয়েছে সে। শাস্তি দেয়ার পর তাকে নিয়ে মুরগির ঘরে ঢুকে পড়লো প্রভু। চারপাশে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে জীবন্ত মাংসপিণ্ড। ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য ইচ্ছে জাগলো তার, কিন্তু প্রভু ধমকে উঠতে উবে গেলো সাহস। পুরো আধ ঘণ্টা প্রভু ঘুরে বেড়ালো ভেতরে। অবশেষে হোয়াইট ফ্যাং বুঝতে পারলো, মুরগিগুলোকে যেন ও ঘাঁটাঘাঁটি না করে সেটাই তার প্রভুর ইচ্ছে। তাই মনে মনে ঠিক করলো, ওগুলোর দিকে আর ফিরেও তাকাবে না সে।

'ওর মুরগি মারার অভ্যেসটা কিছুতেই ছাড়াতে পারবে না,' খাবার টেবিলে বসে ছেলের মুখে হোয়াইট ফ্যাংকে শিক্ষা দেয়ার কথা শুনে বললো বিচারপতি স্কট। 'একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর···'মুখ তার

করে মাথা ঝাঁকালো বুড়ো।

কিন্তু বাবার সাথে একমত হতে পারলো না উইডন স্কট।

'আমি যা বলেছি, তা প্রমাণ করে ছাড়বো,' একগুঁয়ে সুরে বললো সে। 'সারা বিকেল হোয়াইট ফ্যাংকে আটকে রাখবো মুরগির ঘরে।'

'কিন্তু কাজটা করার আগে মুরগিগুলোর কথা একবার ভেবো,' বললো বিচারপতি স্কট।

'ভেবেছি,' বললো স্কট, 'যদি মুরগি মারা যায়, একেকটার জন্যে আমি এক ডলার করে দেবো।'

'জরিমানার একটা শর্ত তোমারও দেয়া উচিত, বাবা,' মাঝখান থেকে বলে উঠলো বেথ।

টেবিলের চারপাশ থেকে একযোগে সবাই সমর্থন করলো বেথের প্রস্তাব। শেষমেষ বুড়োও সম্মতি দিলো মাথা ঝুঁকিয়ে।

'বেশ।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলো উইডন স্কট। 'যদি বিকেলশেষে একটা মুরগিও মারা না যায়, বিচারকের আসনে বসে রায় দেয়ার ভঙ্গিতে গম্ভীরমুখে তোমাকে বলতে হবে, "হোয়াইট ফ্যাং, আমি যতোটা ভেবেছি, তুই তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।" যতোক্ষণ ভেতরে থাকবে হোয়াইট ফ্যাং, তার প্রতি দশ মিনিটের জন্যে এক-বার করে তোমাকে বলতে হবে কথাটা।'

যথেষ্ট কৌতূহলের সাথে পরিবারের সবাই দেখতে লাগলো কাণ্ডটা। ওদিকে মুরগিগুলোর দিকে স্রেফ একবার তাকিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং। একবার শুধু উঠে চৌবাচ্চা থেকে পানি খেলো সে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো আবার। ঘুম ভাঙতে ঘর থেকে বেরিয়ে গম্ভীর-মুখে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো সে। ফলে, বারান্দায় বসে বিচারপতি স্কটকে কথাটা আওড়াতে হলো পরপর ষোলো বার।

কিন্তু আইন শুধু শিখলেই নয়, তার আবার অনেক ফ্যাকড়া আছে। এ-যাবৎ সে শিখেছে, গৃহস্থের কোনো মুরগিকে মারা চলবে না। হাত দেয়া চলবে না তাদের বিড়াল, খরগোশ কিংবা টাকিগুলোর গায়ে।

অথচ একদিন ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। বড়োসড়ো একটা খরগোশ দেখে তেড়ে গেলো ডিক। প্রভু তো কিছু বললোই না, বরং তাকেও উৎসাহ জোগালো তাড়া করার ব্যাপারে। এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইলো হোয়াইট ফ্যাং, তারপরেই ছুটে গেল। তীরবেগে। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে আইনের রহস্যটা উদ্ধার করে ফেললো সে। মুরগি মারা বেআইনী হলেও কাঠবিড়াল কিংবা কোয়েল মারা মোটেই বেআইনী নয়। ওগুলোকে শিকার করার ব্যাপারে কুকুরদের রয়েছে যথেচ্ছ অধিকার। অর্থাৎ, পোষা জীবজন্তুকেই শুধু রক্ষা করতে চায় ঈশ্বরেরা, বুনো জীবজন্তুদের নয়।

উত্তরের বরফের রাজ্যের চেয়ে সান্তা ক্লারা উপত্যকার জীবন অনেক বেশি জটিল। মুহূর্তে মুহূর্তে এখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় নতুন নতুন আইনের সাথে।

থরে থরে মাংস ঝুলছে কসাইয়ের দোকানে, কিন্তু সেগুলো ছোঁয়া চলবে না। প্রভুর সাথে কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলে চুপ করে থাকতে হবে বিড়াল চোখে পড়লেও। রাঁধাবাটের কুকুরগুলো খেঁকিয়ে উঠলেও তাদের আক্রমণ করা চলবে না কিছুতেই। এরপরেও আছে ঈশ্বরদের অত্যাচার। ফুটপাত ধরে হাঁটার সময় তাকে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়বে তারা, আঙুল তুলে দেখাবে একে অপরকে, আদর করতে চাইবে কাছে এসে। প্রভুর নির্দেশে মুখ বুজে সয়ে যায় হোয়াইট ফ্যাং। তবু ব্যাপারটা সহ্য করা একটু শক্ত হয়ে পড়ে যখন ঈশ্বরের দল মাথায় চাপড় মারে আদর করার ছলে।

প্রভুর ঘোড়ার গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটে চলে সে, পাথর ছোঁড়ে বালকের দল। তবু তেড়ে যাওয়া চলবে না তার, পেড়ে ফেলা চলবে না শয়তানগুলোকে। প্রভুর নির্দেশ মানতে গিয়ে এরকম শক্ত কাজও করতে হয় তাকে। সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় সভ্যতার সাথে।

মনে-মনে একটু ক্ষুব্ধ হয় হোয়াইট ফ্যাং। সুবিচার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তার নেই। তবু মনে হয়, প্রভুর উচিত অন্তত এই বালকগুলোর অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করা। অবশ্য এই ক্ষোভ খুব বেশিদিন পুষতে হলো না। একদিন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো প্রভু। চাবুক ঘুরালো সপাং সপাং করে। পড়িমড়ি করে ছুটে পালালো বালকের দল। ভীষণ খুশি হলো হোয়াইট ফ্যাং। এই তো প্রভু, যে উচিত-অনুচিত বোঝে পরিষ্কারভাবে।

এই ধরনের আরো একটা অভিজ্ঞতা হলো অল্পদিনের মধ্যেই। রাস্তার মোড়ে আছে নাপিতের দোকান, আর তার আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে তিনটে বজ্জাত কুকুর। তাকে দেখার সাথেসাথে তেড়ে আসে শয়তানগুলো, কিন্তু কিছু বলতে পারে না হোয়াইট ফ্যাং। কারণ, পোষা জন্তুকে আক্রমণ করার ব্যাপারে কঠোর বারণ আছে প্রভুর। ধীরে ধীরে সাহস বেড়ে যায় কুকুরগুলোর। ওদিকে বারবার হোয়াইট ফ্যাংকে ছুটে পালাতে দেখে মজা পায় নাপিতেরা। একদিন আরো বেশি মজা পাবার জন্যে তারা লেলিয়ে দিলো কুকুর-গুলোকে। আর ঠিক তখনই থেমে গেলো গাড়ি।

মুখ বের করে প্রভু বললো, 'যা।'

বিস্মিতচোখে সে তাকালো প্রভুর দিকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, তাকে সত্যিই যেতে বলা হচ্ছে কিনা। কুকুরগুলোর ওপর একবার

নজর বুলিয়ে আবার তাকালো সে প্রভুর দিকে।

মাথা ঝাঁকালো প্রভু কুকুরগুলোর উদ্দেশে। 'যা, ধর। খেয়ে ফেল সব ক'টাকে!'

আর দ্বিধা করলো না হোয়াইট ফ্যাং। ঝাঁপিয়ে পড়লো বিদ্যুদ্-বেগে। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেলো, দু'টো কুকুর মাটিতে পড়ে ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়, তৃতীয়টা লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মাঠ পেরোবার আগেই নিঃশব্দে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো ছুটে গিয়ে কুকুরটাকে ধরে ফেললো হোয়াইট ফ্যাং, খতম করে দিলো এক কামড়ে।

এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ফলে সাবধান হয়ে গেলো লোকজন। এবং হোয়াইট ফ্যাংকেও আর সইতে হলো না কুকুরদের উৎপাত।

চব্বিশ

ভালোবাসা

মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। কোনো কাজ নেই। তাই বসে বসে খেয়ে মোটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্যাং। মানুষের সহানুভূতি তার ওপরে

ঝরে পড়ছে সূর্যালোকের মতো। ফলে, ভালো মাটিতে বপন করা ফুলের মতো ফুটে উঠছে তার জীবন।

তবু অন্য কুকুরের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি এখনো। বলা যায়, পালিয়ে না গিয়ে ঘুমিয়ে আছে তার ভেতরের নেকড়েটা।

একেবারে শৈশব থেকেই কুকুরদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছে তার। আর সেজন্যেই আজো সে নিঃসঙ্গ। অবশ্য নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে মোটেই আপত্তি নেই তার। বস্তুত এভাবে জীবন কাটাবে বলেই নিজের তাবৎ ভালোবাসা সে সঁপে দিয়েছে মানুষের পায়ে।

দক্ষিণের দেশের প্রত্যেকটা কুকুরই তার দিকে তাকায় সন্দেহের দৃষ্টিতে। খুনো জন্তু সম্বন্ধে আজন্ম একটা ভয় বাসা বেঁধে আছে তাদের মনে। অবশ্য এগুলোকে আর ইদানীং লড়াইয়ের যোগ্য মনে করে না হোয়াইট ফ্যাং। সে জানে, কাপুরুষগুলোর দিকে চেয়ে চোখ গরম করে দাঁত খিঁচোনোই যথেষ্ট।

একটাই যন্ত্রণা আছে তার—কলি। জীবনটা একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছে এই মাদি কুকুরটা। মুরগি মারার ঘটনাটা কেন যেন ভুলতে পারেনি কলি। তারপর থেকেই সবসময় সে অনুসরণ করে হোয়াইট ফ্যাংকে, ঠিক যেমন চোরকে অনুসরণ করে পুলিশ। একটা কবুতর কিংবা মুরগির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকানোটাও বরদাস্ত করে না কলি। এমন চিৎকার জুড়ে দেয়, যেন মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনেক ভেবেচিন্তে তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা বুদ্ধি বের করেছে হোয়াইট ফ্যাং। কলিকে এড়ানোর যখন আর কোনো উপায়ই থাকে না, সামনের দুই থাবার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ঘুমের ভান

করে সে। এই ব্যাপারটা কলির পক্ষে ভীষণরকম বিভ্রান্তিকর। নেকড়ে-টাকে ঘুমোতে দেখলে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় অন্যদিকে।

কলি ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই তার। হিংস্রতা পুরোপুরি উবে না গেলেও আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে এসেছে হোয়াইট ফ্যাং। কারণ, চারপাশে তার এখন বয়ে চলেছে নিরুপদ্রব একটা জীবন। মেরু-রাজ্যের হিংস্রতা এখানে নেই, যেখানে-সেখানে ওত পেতে নেই হরেক রকমের শত্রু। সত্যি বলতে কি, অজানা শত্রুর সেই বদ্ধমূল আতঙ্কটাও কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

মাঝেসাঝে বরফের স্পর্শ পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে তার মন। কিন্তু সে-আকুলতার ব্যাপারটা ঘটে শুধুই অবচেতনে। ফলে শীতের সময়েও বরফের দেখা না পেয়ে তার হয়তো মনে হয়, দক্ষিণের দেশের গ্রীষ্মকাল বড়ো বেশি দীর্ঘ।

জীবনে যে কয়েকটা জিনিস হোয়াইট ফ্যাং সবচেয়ে অপছন্দ করে, মানুষের হাসি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু প্রভুও যখন তাকে উদ্দেশ্য করে হাসতে লাগলো, কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারলো না সে। প্রভুর ওপর রাগ করা সম্ভব নয়, আবার ঠিক সহ্যও হয় না জিনিসটা। দিনের পর দিন তাকে দেখলেই হাসতে লাগলো প্রভু। আর সেই হাসি দেখতে দেখতে শেষমেষ হাসতে শিখে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

প্রভুর সাথে খুনসুটি করার একটা অভ্যেসও গড়ে উঠলো তার। জড়িয়ে ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় প্রভু। সে-ও ঝাঁপ দেয় প্রভুকে লক্ষ্য করে। হিংস্রতার অভাব থাকে না তার আচরণে, কিন্তু কামড়টা সে দেয় শূন্যে। আর এই নকল কামড়ের জন্যে ঘুসি মারার ভান করে প্রভু। অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে ঝলঝলে চোখে তারা চেয়ে থাকে পর-

স্পরের দিকে। তারপর হেসে ওঠে একসাথে।

প্রভু ছাড়া আর কারো সাথে খুনসুটি করা তার চরম অপছন্দ। একজন সে-চেষ্টা করেছে ঠিকই, কিন্তু বরদাস্ত করেনি হোয়াইট ফ্যাং। দাঁত বের করে বুঝিয়ে দিয়েছে, তার মন অতো সস্তা নয়। শুধু প্রভুর মতো মানুষেরাই সেটা জয় করতে পারে।

প্রায়ই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়ে প্রভু। সঙ্গ দেয় হোয়াইট ফ্যাং। মেরুরাজ্যের মতো স্লেজ টানার বালাই নেই দক্ষিণের দেশে। তাই ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটতে ভালোই লাগে তার। জাত নেকড়ের রক্ত আছে হোয়াইট ফ্যাং-এর শরীরে, তাই ছোটার ব্যাপারে সে ক্লান্তিহীন। একনাগাড়ে পঞ্চাশ মাইল ছুটে যায় সে, এবং বাড়ি ফিরতে ফিরতে পরাজিত করে প্রভুর ঘোড়াকে।

ঘোড়ার সাথে ছুটতে ছুটতেই একদিন এমন একটা কাণ্ড করে বসলো হোয়াইট ফ্যাং, যা সে জীবনে আর কখনোই করেনি। প্রভু তার ঘোড়াটাকে অভ্যস্ত করতে চাইছিলো পিঠ থেকে না নেমেই দরজা খোলা আর বন্ধ করার ব্যাপারে। কিন্তু ভয় পেয়ে দরজার কাছ থেকে বারবার পিছিয়ে আসছিলো ঘোড়াটা। চুপচাপ কয়েকবার দেখার পর এই বেআদবি আর সহ্য হলো না হোয়াইট ফ্যাং-এর। লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পথরোধ করে দাঁড়ালো সে, আর তারপরেই ডেকে উঠলো অবিকল কুকুরদের মতো।

এরপরেও ভোগার চেষ্টা করেছে সে, উৎসাহ জুগিয়েছে প্রভু, কিন্তু আর মাত্র একবারই করতে পেরেছে কাজটা, তা-ও প্রভুর অনুপস্থিতিতে। ঘটনার দিনে যথারীতি বেড়াতে বেরিয়েছে প্রভু। হঠাৎ একটা খরগোশ লাফিয়ে পড়লো ঘোড়ার পায়ের কাছে। ভয় পেয়ে ওপরদিকে লাফ দিলো ঘোড়াটা, ছিটকে পড়ে একটা পা ভেঙে গেলো

প্রভুর মাথায় আগুন ধরে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। কেবল ঝাঁপ দেবে ঘোড়াটার টুঁটি লক্ষ্য করে, এমন সময় বাধা দিলো প্রভু।

বললো, 'যা। বাড়ি যা।'

কিন্তু প্রভুকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে মোটেই নেই তার। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে স্কট কথা বলতে লাগলো গম্ভীর গলায়।

'যা। বাড়ি যা। আমার জন্যে চিন্তা করিস না। বাড়ি গিয়ে সব্বাই-কে বল, পা ভেঙে গেছে আমার। তবু চুপ করে বসে থাকে। এই নেকড়ে, বাড়ি যা।'

আর কিছু না বুঝলেও হোয়াইট ফ্যাং 'বাড়ি' শব্দটার অর্থ বোঝে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়ালো সে, রওনা দিলো ধীরে ধীরে। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই আবার ফিরে তাকালো প্রভুর দিকে।

'যা বলছি!' চেঁচিয়ে উঠলো স্কট। এবারে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ছুটতে শুরু করলো হোয়াইট ফ্যাং।

বিকেলে পরিবারের সবাই বসেছিলো বারান্দায়, এমন সময় হোয়াইট ফ্যাং এসে পৌঁছুলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

'উইডন এসেছে,' বললো তার মা।

হৈহৈ করতে করতে বাচ্চাদু'টো ছুটে গেলো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। কিন্তু তাদের এড়িয়ে কুকুরটা চলে গেলো বারান্দার এক কোণে। ওখানেই দৌড়ে গেলো দুই বাচ্চা। এবারে ধাক্কা মেরে তাদের ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো হোয়াইট ফ্যাং, তারপরেই গর্জন ছাড়লো একটা। শঙ্কা ফুটে উঠলো ম্যালিসের চোখে।

'বাচ্চারা ওটার কাছে গেলেই ভীষণ ভয় লাগে ,' বললো সে। 'কোনদিন না হঠাৎ আবার আক্রমণ করে বসে।'

এবারে সত্যিসত্যিই বাচ্চা দু'টোকে উল্টে ফেলে দিলো হোয়াইট

ফ্যাং. সেইসাথে ছাড়তে লাগলো ভয়াবহ গর্জন। বাচ্চাগু'টোকে কাছে নিয়ে এলো অ্যালিস। বুঝিয়ে বললো, এ-সময় হোয়াইট ফ্যাংকে বিরক্ত না করাই ভালো।

'নেকড়ে নেকড়েই,' বললো বিচারপতি স্কট। 'কোনোভাবেই এদের বিশ্বাস করা যায় না।'

'কিন্তু ওটা তো পুরোপুরি নেকড়ে নয়, বাবা,' ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ নিয়ে বলে উঠলো বেথ।

'ভাইয়ের সুরে সুর মেলানো ছাড়া তো আর কিছু শিখিসনি,' রেগে গেলো বুড়ো। 'তোর ভাইটাও সঠিক কিছু জানে না। কুকুরটা নেকড়ে নয়—এটা হলো গিয়ে তার ধারণা। কিন্তু ব্যাটাকে দেখলে তো—'

কথা শেষ হবার আগেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং, গর্জে উঠলো হিংস্র ভঙ্গিতে।

'ভাগ্, ভাগ্ বলছি! শুয়ে পড়!' গলা চড়ালো বিচারপতি স্কট।

এবারে হোয়াইট ফ্যাং ঘুরলো অ্যালিসের দিকে। পোশাকের একটা প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে টানতে লাগলো প্রাণপণে। চিৎকার করতে লাগলো অ্যালিস, দেখতে দেখতে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেলো পোশাকের নিচের দিকটা। ইতোমধ্যে কিছুটা শান্ত হয়ে পড়েছে হোয়াইট ফ্যাং। উধাও হয়েছে গলার ভেতরের গরগর শব্দটা, কিন্তু ঠোঁটদু'টো কাঁপছে থরথর করে। যেন কিছু একটা বলার জন্যে ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না বেচারি।

'কুকুরটা না আবার পাগল হয়ে যায়,' বললো স্কটের মা। 'ছেলেটাকে আমি আগেই বলেছিলাম, সুমেরুর জানোয়ার এখানকার গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারবে না!'

'আমার তো মনে হয়, কিছু একটা বলতে চায় ও,' ঘোষণা করলো

বোধ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন তাৎ: খুঁ: । হোয়াইট ফ্যাং জীবনে দ্বিতীয় এবং শেষবারের মতো ডেকে উঠলো। সে অবিকল কুকুর-দের অনুকরণে।

'উইডনের কিছু একটা হয়েছে,' দৃঢ় গলায় বললো অ্যালিস।

এবার টনক নড়লো পরিবারের সবার। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। আজ এমন একটা কাজ করেছে সে, যা অর্থবহ করে তুলেছে তার পুরো জীবনটাকে।

এই ঘটনার পর সিয়েরা ভিস্তার সবার মন জয় করে নিলো সে। কামড় খাওয়া সহিসটা পর্যন্ত বলতে লাগলো যে, কুকুরটা যদি নেক-ড়েও হয়, ওটার বুদ্ধির ব্যাপারটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং নেকড়ে ছাড়া আর কিছুই নয়—একগুঁয়ের মতো নিজের এই মতটা আঁকড়ে রইলো বিচারপতি স্কট, আর এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে নেকড়ে-বিষয়ক জ্ঞান বিতরণ করতে করতে মহাবিরক্ত করে তুললো পরিবারের সবাইকে।

সান্তা ক্লারা উপত্যকায় আসার পর দেখতে দেখতে কেটে গেলো দু'দুটো বছর। হঠাৎ অদ্ভুত একটা আবিষ্কার করে বসলো হোয়াইট ফ্যাং। কলি এখনো তাকে কামড়ায় বটে, কিন্তু তাতে যেন আর আগের সেই ধার নেই। বরং সে-কামড়ে আছে একটা মজা পাবার মতো ব্যাপার। তার চেয়ে মজার কথা হলো, ইদানীং কলির সাথে খেলা করার একটা ইচ্ছে জাগছে তার। সত্যি সত্যিই একদিন সাড়া দিলো সে।

একদিন বিকেলে কলি তাকে ঠেলতে লাগলো বেড়াতে

হোয়াইট ফ্যাং

জনো। পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং। তৈরি হয়ে আছে ঘোড়া, প্রভুর বেড়ানোর সময় হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেললো সে। এতোদিনের শিক্ষা, এমনকি প্রভুর আকর্ষণ পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেলো কলির আকর্ষণের কাছে। সেদিন ঘোড়ার পিঠে চেপে একাএকাই বেরোতে হলো প্রভুকে। কলির পাশাপাশি হোয়াইট ফ্যাং ছুটে চললো বনপথ ধরে, ঠিক যেমন অনেকদিন আগে তার মা—কিচ্ আর একচোখো ছুটেছিলো স্নেকের বনপথে।

পঁচিশ

ঘুমন্ত নেকড়ে

হঠাৎ হৈহৈ পড়ে গেলো চারদিকে। বড়ো বড়ো অক্ষরে প্রত্যেকটা সংবাদপত্রে ছাপানো হলো সংবাদটা। একজন কয়েদি পালিয়েছে স্যান কোয়েনটিন জেল থেকে। লোকটা হিংস্র। বরাবরই হিংস্র। তবে এই হিংস্রতা একদিনে আসেনি। ঘৃণা ছাড়া এক বিন্দু সহানুভূতিও সে পায়নি সমাজের কাছ থেকে। ঘৃণার সেই স্তূপই জন্ম দিয়েছে মানুষ নামের এই দানবের। মানুষের দেহ ছাড়া আচার-আচরণ সবদিক দিয়ে সে পশুর সমতুল্য। আর সে পশু এমনই ভয়ঙ্কর, যে তাকে মাংসাশী বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

স্যান কোয়েনটিন জেল কর্তৃপক্ষ তাকে ঘোষণা করেছে সংশোধনের অযোগ্য বলে। কোনো শাস্তিই তাকে বশে আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমাজ তাকে যতো কঠোর হাতে দমন করতে চেয়েছে, সে হয়েছে ততোধিক হিংস্র। স্ট্রেট জ্যাকেট পরানো, অনাহারে রাখা, গদা দিয়ে পেটানো ইত্যাদি অন্য কয়েদিদের বশে আনার ব্যাপারে উপযুক্ত হলেও জিম হলের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ। কারণ, শৈশব থেকেই সে শাস্তি পেতে অভ্যস্ত। জিম হল নামের যে বালকটি বাস করতো সানফ্রান্সিসকোর বস্তিতে, সে ছিলো একতাল কাদার মতো। সমাজ তাকে গড়ে নিতে পারতো আপন ইচ্ছে অনুসারে। কিন্তু সেরকম কোনো ইচ্ছে সমাজের জাগেনি। তাদের ঝোঁক ছিলো শুধু শাস্তি দেয়ার দিকে।

তৃতীয়বার জেলে যাবার পর জিম হলকে চোখেচোখে রাখার দায়িত্ব পড়লো এমন এক পাহারাদারের ওপর, শয়তানিতে যে তার চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। সবসময় তার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো পাহারাদারটা, ভালো কোনো কাজ করলে চেপে গেলো, কিন্তু ওয়ার্ডেনের কাছে মিছে কথা বলে মাঝেসাঝেই শাস্তির ব্যবস্থা করতে ভুল করলো না। পাহারাদারের ছিলো একগোছা চাবি আর একটা রিভলভার, পক্ষান্তরে জিম হলের ছিলো খালি হাত আর দু'পাটি ঝকঝকে দাঁত। কিন্তু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই দু'টো অস্ত্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র হার মানলো। সুযোগ বুঝে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লো জিম হল, পরমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ দাঁতের হিংস্র কামড়ে ফাঁক হয়ে গেলো পাহারাদারের গলা।

এই ঘটনার পর জিম হলকে স্থানান্তরিত করা হলো সংশোধনের অযোগ্য কয়েদিদের জন্যে নির্দিষ্ট সেলে। সেলগুলোর দেয়াল, মেঝে, এমনকি ছাদ পর্যন্ত লোহার। দিনই এখানে গোধূলির মতো, রাত আসে নিকষ কালো স্তব্ধতার চাদর মুড়ে। আর লোহার এই কবরেই

জিম হল কাটিয়ে দিলো পুরো তিনটে বছর। কোনো মানুষের দেখা পেলো না। থাবার সময় শব্দ করলো জন্তুর মতন। অবশেষে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা তাকে এমন এক দানবে রূপান্তরিত করলো, কস্মিনকালে যার কথা কল্পনা করেনি অতি বড়ো কোনো উন্মাদও।

তারপর এক রাতে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেলো জিম হল। ওয়ার্ডেনের মতে, এখান থেকে পালানো অসম্ভব। কিন্তু শূন্য সেল নির্দেশ করছে, ব্যাপারটা সম্ভব। সেলের মুখেই পড়ে আছে একজন পাহারাদারের মৃতদেহ। আরো দু'জনকে পাওয়া গেলো বাইরের দেয়ালের পাশে। শব্দ এড়ানোর জন্যে এই দুই পাহারাদারকে জিম খতম করেছে খালিহাতে।

মৃত তিন পাহারাদারের অস্ত্র নিয়ে গেছে জিম। দাবানলের মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা। কালবিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সমাজ। তার মাথার জন্যে ঘোষিত হলো মোটা অঙ্কের পুরস্কার। বন্দুক হাতে নেমে পড়লো লোভী কৃষকেরা। কারো লক্ষ্য পুরস্কারটা পেয়ে ঋণ শোধ করা, কেউ আবার ছেলেকে পাঠাতে চায় কলেজে। রাইফেল নিয়ে ধাওয়া করলো সচেতন নাগরিকের দল। কয়েদির একটা পা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে পাঠিয়ে দেয়া হলো একপাল ব্লাডহাউণ্ডকে। কোনো অংশে কম গেলো না আইনের হাউণ্ডেরাও। সংবাদ শুঁকতে শুঁকতে ছুটলো তারা কয়েদির পিছুপিছু।

অনেকেই দেখা পেলো তার। কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলো না কেউই। তাদের এই বীরত্বব্যঞ্জক মৃত্যু প্রভূত আনন্দ দিলো সকালবেলার সংবাদপত্র পাঠকদের। একে একে ফিরে এলো বীরদের লাশ। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে মানুষ-শিকারের রোমহর্ষক খেলায় নেমে পড়লো আরেকদল বীর।

আর তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেলো জিম হল। অনুসরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ব্লাডহাউণ্ডের পাল, পাহাড়-পর্বত তোলপাড় করে ফেললো মানুষ-শিকারীর দল, কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। কপূ'রের মতোই উবে গেছে ভয়ঙ্কর কয়ে । তবে ইতোমধ্যে ঘটলো মজার সব কাণ্ড। গোটা বারো জিম হলের লাশ আবিষ্কৃত হলো বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে।

সারা দেশের মতো সংবাদপত্র পৌঁছুলো সিয়েরা ভিস্তাতেও। কিন্তু সে-সংবাদ পড়ে সিয়েরা ভিস্তার অধিবাসীরা যতোটা না কৌতূহলী, তার চেয়ে বেশি হলো উদ্বিগ্ন। মেয়েরা ভয় পেলো। হেসে পুরো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো বিচারপতি স্কট, কিন্তু অভিনয়টা ভালোমতো জমলো না। কারণ, বিচারের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেছে তার। শেষবার তার রায়েই জেলে যায় জিম হল। এবং যাবার আগে আদালত ভরা লোকের সামনে এই বলে শাসিয়ে যায় যে, সে বিচারপতির রায়ে বিনা অপরাধে তাকে জেলে যেতে হচ্ছে জেল থেকে বেরিয়ে তাকে সে দেখে নেবে।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে, অন্তত তৃতীয়বার জিম হল ছিলো সম্পূর্ণ নির্দোষ। পুলিশের ষড়যন্ত্রের ফলে ফেঁসে যায় সে। আর অতীত কার্যকলাপের রেকর্ড ঘেঁটে বিচারপতি স্কটের মনে হয়, এই লোক দোষী না হয়েই যায় না।

তবে সে রায়ের ফলে জিম হলের পঞ্চাশ বছরের কারাদণ্ড হয়, তার জন্যে বিচারপতি স্কটেরও কোনো অপরাধ ছিলো না। সে ভাবতেও পারেনি, এতোবড়ো একটা ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট হতে পারে, আর এভাবে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে গেছে পুলিশের জালে। ওদিকে জিম হলের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে, বিচারপতি নির্দোষ। সে

ভেবেছে, পুরো ষড়যন্ত্রের মূলে আছে বিচারপতি স্কট, তাই রায় ঘোষণার সাথেসাথে রেগে আগুন হয়ে গেছে সে, লাফালাফি শুরু করেছে আদালতের মধ্যে। শেষমেষ গোটা ছয়েক পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটিয়ে শুইয়ে ফেলেছে তাকে। বলা বাহুল্য, বিচারপতি স্কটকে দোষী ভাবার কারণে জিম হলের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছে তার ওপর। তাই বিচারপতি ছাড়া আর কাউকেই শাসায়নি সে। এর পরের ঘটনা সবারই জানা। জেল খাটতে গেলো জিম হল···এবং পালিয়ে গেলো মেয়াদ পেরোবার আগেই।

কিন্তু হোয়াইট ফ্যাং যেহেতু খবরের কাগজ পড়তে পারে না, এতো-বড়ো একটা ঘটনার কিছুই জানতে পারেনি সে। এদিকে স্কটের পা ভাঙার খবর এনে দেয়ার পর থেকে গোপন একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে তার আর অ্যালিসের মধ্যে। প্রতি রাতে সিয়েরা ভিস্তার সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপিচুপি উঠে আসে অ্যালিস, শেকল খুলে হোয়াইট ফ্যাংকে নিয়ে যায় হলঘরে। কিন্তু কুকুরটাকে যেহেতু বাড়ির ভেতরে আনার কোনো অনুমতি নেই, ভোরে সবার আগে আবার উঠে পড়ে অ্যালিস। হোয়াইট ফ্যাংকে রেখে আসে যথাস্থানে।

এমনি এক রাতে হঠাৎ জেগে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। উঠতে গিয়েও শুয়ে পড়লো আবার। তারপর নাক তুললো ওপরদিকে। হ্যাঁ, যা ভেবেছে, তা-ই। অচেনা এক ঈশ্বরের গায়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। এবারে কান খাড়া করলো সে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। অত্যন্ত সন্তর্পণে হেঁটে বেড়াচ্ছে ঈশ্বরটা। কিন্তু তার চেয়েও সন্তর্পণে হাঁটতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং। প্রকৃতিই তাকে দিয়েছে নিঃশব্দে চলার ক্ষমতা। তাছাড়া মানুষের মতো কোনো পোশাকও তার নেই যে খসখস শব্দ হবে শরীরের সাথে লেগে।

বড়ো সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে থেমে, কান খাড়া করলো ঈশ্বরটা। ওপরেই থাকে প্রভু আর তার পরিবার। মৃতের মতো স্তব্ধ হয়ে রইবে। হোয়াইট ফ্যাং। ডেকে বাড়ি মাথায় তুললো না। কারণ, কুকুরের মতো ডেকে ওঠা ধাতেই নেই তার। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে গেলো সমস্ত লোম, তবু চুপ করে রইলো হোয়াইট ফ্যাং। কিন্তু বুঝতে বাকি রইলো না যে, তার অগ্নিপরীক্ষার দিন উপস্থিত। বেশ কিছুদিন ধরে যে নেকড়েটা ঘুমিয়ে আছে তার ভেতরে, আজ তাকে জাগাতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো ঈশ্বরটা। আর ঠিক তখনই আঘাত হানলো হোয়াইট ফ্যাং। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে তার শরীরটা উঠে গেলো শূন্যে, পরমুহূর্তেই নেমে এলো ঈশ্বরের ওপর। সামনের দু'পা চেপে বসলো ঈশ্বরের কাঁধে, একইসাথে তীক্ষ্ণ দাঁত ঢুকে গেলো ঘাড় ভেদ করে। হুড়মুড় করে দু'জনেই পড়ে গেলো মেঝের ওপরে। লাফিয়ে পেছনে সরে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। ওঠার চেষ্টা করলো লোকটা, কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে আঘাত হানলো হোয়াইট ফ্যাং।

চমকে জেগে গেলো পুরো সিয়েরা ভিস্তা। নিচতলায় যেন লড়াই বেধেছে দানবে-দানবে। উপর্যুপরি রিভলভারের গুলি হলো, তারপরেই ভেসে এলো আতঙ্কিত চিৎকার। মুহূর্তে সে-চিৎকার হারিয়ে গেলো রক্ত হিম করা গর্জনে। সশব্দে উল্টে পড়লো আসবাবপত্র, ঝন্‌ঝন্ করে ভাঙলো কাচ।

কিন্তু যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো, তেমনি আবার হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেলো হুটোপুটির শব্দটা। জড়াজড়ি করে সবাই দাঁড়িয়ে রইলো সিঁড়ির মাথায়। ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ ভেসে এলো নিচতলা থেকে, যেন বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়েছে পানিতে। দেখতে দেখতে আরো অস্পষ্ট হয়ে গেলো সে শব্দ, তারপর ডুবে গেলো ধীরে ধীরে। এবার

শোনা গেলো একটা হাঁসফাঁস শব্দ, যেন কোনো প্রাণী প্রাণপণ চেষ্টা করছে শ্বাস নেয়ার জন্যে।

একটা সুইচ টিপলো উইডন স্কট। আলোর বন্যায় ভেসে গেলো সিঁড়ি আর হলঘর। রিভলভার বাগিয়ে অত্যন্ত সাবধানে নিচতলায় নামলো সে আর বিচারপতি স্কট। তবে সাবধানতার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। ভাঙা আসবাবপত্রের মাঝখানে, এক হাতে আংশিক মুখ ঢেকে পড়ে আছে একটা লোক। উইডন স্কট নিচু হয়ে সরিয়ে দিলো হাতটা। ফাঁক হয়ে যাওয়া গলা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, কিভাবে নেমে এসেছে মৃত্যু।

'জিম হল,' বললো বিচারপতি স্কট। তারপর পিতা-পুত্র মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে।

এবারে দু'জনে তাকালো হোয়াইট ফ্যাং-এর দিকে। জিম হলের মৃতদেহের পাশেই পড়ে আছে কুকুরটা। চোখদুটো বোজা, কিন্তু তার নিচু হতে সামান্য উঠে গেলো চোখের পাতা। লেজ নড়ানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলো হোয়াইট ফ্যাং। পিঠ চাপড়ে দিলো উইডন স্কট। অত্যন্ত ক্ষীণ গরগরে শব্দ বেরিয়ে এলো তার গলার ভেতর থেকে। যেন বুঝিয়ে দিতে চায়, প্রভুর হাতের স্পর্শ টের পেতে অসুবিধে হয়নি তার। শব্দটা করার পরপরই ঝপ্ করে আবার নেমে এলো চোখের পাতা, শরীর টানটান করে স্থির হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং।

'আহা! বেচারিকে বোধ হয় আর বাঁচানো যা ।,' বিড়বিড় করে বললো স্কট।

'তবে আমরা ওকে সহজে মরতে দেবো না,' দৃঢ় গলায় কথাটা বলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো বিচারপতি স্কট।

'সত্যি বলতে কি, ওর বাঁচার সম্ভাবনা হাজারে এক ভাগ,' প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হোয়াইট ফ্যাংকে পরীক্ষা করার পর মতামত জানিয়ে দিলো সার্জন।

জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে প্রথম ঊষার আলো। বাচ্চারা বাদে আর সবাই জড়ো হয়েছে সার্জনের চারপাশে।

'পেছনের একটা পা ভেঙে গেছে,' বলে চললো সার্জন। 'পাঁজরের হাড় ভেঙেছে তিনটে, যার মধ্যে অন্তত একটা ঢুকে গেছে ফুসফুস ফুটো করে। শরীর রক্তশূন্য হয়ে গেছে বললেই চলে। নিশ্চয় মারাত্মক কোনো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে ভেতরে। এসব ছাড়াও ওকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে তিন তিনটে বুলেট। আমি যে বললাম হাজারে এক ভাগ, ওটা বলেছি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে। আসলে ওর বাঁচার সম্ভাবনা দশ হাজারের এক ভাগও নয়।'

'ওর যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসার দরকার,' বললো বিচারপতি স্কট। 'খরচের কথা ভাববেন না। এক্স-রে করুন—আরো যা যা প্রয়োজন। উইডন, সানফ্রান্সিসকোতে ফোন করে ডাক্তার নিকলস্‌কে আসতে বলো। ব্যাপারটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, সার্জন। সম্ভাবনা যতো ক্ষীণই থাক, চেষ্টার কোনো ত্রুটি আমরা করতে চাই না।'

সার্জন হাসলো। 'অবশ্যই! যতোখানি পারা যায়, চেষ্টা করতে হবে। কুকুরটা যা করেছে, তাতে মানুষের মতোই যত্ন হওয়া উচিত ওর। তাপমাত্রা সম্বন্ধে যা-যা বলেছি, সেগুলো যেন আবার ভুলে যাবেন না। বেলা দশটায় আমি আবার আসবো।'

যত্ন শুরু হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর। বিচারপতি স্কট নার্স ডাকতে চাইলো, কিন্তু সাথেসাথে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো বাড়ির মহিলারা। এদিকে দশ হাজারের এক ভাগের অতি বিরল সম্ভাবনাটুকুকে

আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগলো হোয়াইট ফ্যাং।

অবশ্য সার্জন যে মত প্রকাশ করেছে, সেজন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না। সারাজীবন ধরে সে অপারেশন করে এসেছে সভ্যতার নিরাপদ আশ্রয়ে বংশ পরম্পরায় বেড়ে ওঠা দুর্বল মানুষদের। ফলে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব হয়নি যে, হোয়াইট ফ্যাং একেবারেই অন্য ধাতুতে গড়া। শৈশব থেকেই যে জীবন সে যাপন করে আসছে, মানুষের জীবন সেই তুলনায় নিতান্তই দুর্বল। তার মা-বাপ কিংবা পূর্বপুরুষদের কারো মধ্যে ছিলো না কোনোরকম দুর্বলতার চিহ্ন। স্রেফ টিকে থাকার তাগিদে অহরহ সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদের। স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি তারা নিরাপত্তার কথা। উত্তরাধিকারসূত্রে হোয়াইট ফ্যাং পেয়েছে তাদের সংগ্রামমুখর জীবন। তাই বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছের ভরপুর তার প্রতিটি রক্তবিন্দু।

সারা শরীরে প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় চুপচাপ পড়ে রইলো হোয়াইট ফ্যাং। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেলো। সুদীর্ঘ ঘুমের মধ্যে অসংখ্য স্বপ্ন দেখলো সে। ছায়াছবির মতো বারবার ভেসে উঠলো সুমেরুর জীবন। গুহার ভেতরে টলমল করতে করতে কিচের দিকে এগিয়ে গেলো একটা ধূসর রঙের বাচ্চা, পরক্ষণেই কাঁপতে কাঁপতে গ্রে বীভারের হাঁটুর কাছে গিয়ে স্বীকার করলো বশ্যতা। হঠাৎ যেন কোত্থেকে ছুটে এলো লিপ-লিপ, পেছনে পেছনে তেড়ে এলো তার কুকুরছানার দল।

ছুভিক্ষ! ছুভিক্ষ! এক টুকরো মাংসের আশায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে; তারপরেই ছুটতে লাগলো স্লেজ নিয়ে। 'রা! রা!'—চিৎকার করে উঠলো মিট শা স্লীর গ্রে বীভার, বাতাস কেটে সাঁই করে নেমে এলো নির্দয় চাবুক। এবারে নিজেকে সে আবিষ্কার

করলো। বিউটি স্মিথের খাঁচায়, চারপাশ থেকে গর্জে উঠলো বিভিন্ন জাতের কুকুর। ঘুমের ঘোরেই মৃদু গর্জন ছাড়লো হোয়াইট ফ্যাং। উপস্থিত মহিলারা বললো, দুঃস্বপ্ন দেখছে বেচারি!

বিশেষ করে একটা দুঃস্বপ্ন তাকে বারবার তাড়া করে ফিরেছে। কথা নেই বার্তা নেই, সময় নেই অসময় নেই, অতিকায় বুনো লিংক্সের মতো ছুটে এসেছে বৈদ্যুতিক গাড়িগুলো। হয়তো একটা কাঠবিড়ালের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে সে। অনেকক্ষণ পর গাছের আগ্রয় ছেড়ে কাঠবিড়ালটা নামলো মাটিতে। বিদ্যুদ্বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাঠবিড়ালের ওপর। কিন্তু চোখের পলকে সে কাঠবিড়াল রূপান্তরিত হয়ে গেলো বৈদ্যুতিক গাড়িতে, কান ফাটানো গর্জনের সাথে আগুন ছুঁড়তে লাগলো তার দিকে। আবার আকাশ থেকে সাঁ করে কখনো নেমে এলো বাজপাখি। সে রুখে দাঁড়াতেই বাজপাখিটা হয়ে গেলো বৈদ্যুতিক গাড়ি। আবার কখনো কখনো বিউটি স্মিথের খাঁচায় বন্দী হয়ে পড়লো সে। খাঁচার বাইরে লোকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলো, লড়াই হবে আজ। ধীরে ধীরে খুলে গেলো খাঁচার দরজা। কিন্তু কুকুরের বদলে ভেতরে ঢুকে পড়লো বৈদ্যুতিক গাড়ি। হাজার হাজারবার দুঃস্বপ্নটা দেখলো হোয়াইট ফ্যাং, আর প্রত্যেকবারই চমকে উঠলো প্রচণ্ড আতঙ্কে।

অবশেষে উপস্থিত হলো সেই বিশেষ দিনটি। সমস্ত প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজ খুলে নেয়া হলো হোয়াইট ফ্যাং-এর শরীর থেকে। আনন্দের ফোয়ারা ছুটলো সিয়েরা ভিস্তায়। দুই কানের গোড়া ডলে দিলো প্রভু, গরগর করে উঠলো হোয়াইট ফ্যাং। অ্যালিস তার নাম রাখলো 'বীর নেকড়ে' সাথেসাথে হৈহৈ করে সে-নাম গ্রহণ করলো পরিবারের সবাই।

অনেক ক'বার চেষ্টা করার পর কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং, কিন্তু প্রায় সাথেসাথেই পড়ে গেলো হুড়মুড় করে। ভীষণ দুর্বল হয়েছে শরীর। একনাগাড়ে শুয়ে থেকে থেকে যেন নরম হয়ে গেছে পেশিগুলো। নিজের অক্ষমতার জন্যে অত্যন্ত লজ্জা পেলো হোয়াইট ফ্যাং। এই বাড়ির সবার প্রতি তার যে কর্তব্য কতো দিন ধরে সে-কর্তব্য সে পালন করতে পারেনি! এই চিন্তাই যেন বাড়তি খানিকটা শক্তি জোগালো তার দেহে। টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়ালো হোয়াইট ফ্যাং, শরীরটাকে দোলাতে লাগলো সামনে-পেছনে।

'বীর নেকড়ে!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো মহিলারা।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে একে একে সবার দিকে তাকালো বিচারপতি স্কট।

'শেষমেষ স্বীকার করলে তাহলে,' বললো বুড়ো। 'একমাত্র আমার ধারণাই ছিলো বরাবর ঠিক। ও যা করেছে, কোনো কুকুরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আসলেই ও নেকড়ে।'

'বলো, বীর নেকড়ে,' বললো তার স্ত্রী।

'হ্যাঁ, বীর নেকড়ে,' সায় দিলো বিচারপতি। 'এখন থেকে আমি ওকে এই নামেই ডাকবো।'

'ওকে হাঁটানোর অভ্যেস করাতে হবে,' বললো সার্জন; 'আমার তো মনে হয়, কাজটা এখনই শুরু করা উচিত। ভয়ের কিছু নেই, হাঁটতে এমন কিছু কষ্ট হবে না ওর। চলুন, ওকে বাইরে নিয়ে চলুন।'

সিয়েরা ভিস্তার সবার সামনে সামনে সম্রাটের মতো হেঁটে চললো হোয়াইট ফ্যাং। লনে পৌঁছে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়লো সে।

একটু পরে আবার উঠে রওনা দিলো। মাংসপেশির সঞ্চালনের সাথেসাথে হোয়াইট ফ্যাং অনুভব করলো, ধীরে, খুব ধীরে ফিরে

আসছে শক্তি। একসময় সে পৌঁছুলো আস্তাবলের কাছে। দরজার পাশেই চুপ করে শুয়ে আছে কলি, আর তাকে ঘিরে খেলা করছে গোটা ছয়েক নাদুসনুদুস বাচ্চা।

চোখ বড়োবড়ো করে তাকালো হোয়াইট ফ্যাং।

তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠে সাবধান করে দিলো কলি। না, কাছে যাবার মতো ভুল করবে না হোয়াইট ফ্যাং। কারণ, কলিকে সে চেনে। পা দিয়ে একটা বাচ্চাকে তার দিকে ঠেলে দিলো প্রভু। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেলো তার। কিন্তু প্রভুর ধমক শুনে বুঝতে পারলো, ভয়ের কিছু নেই। ইতোমধ্যে কলিকে কোলে তুলে নিয়েছে এক মহিলা। সেখান থেকেই আবার গর্জে উঠে সে জানিয়ে দিলো, বাচ্চার কিছু হলে ভয়ের ব্যাপার আছে।

টলমল করতে করতে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো বাচ্চাটা। কান খাড়া করে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলো অদ্ভুত জানোয়ারটার দিকে। তারপর নাকে নাক ঘষলো দু'জনে। হোয়াইট ফ্যাং অনুভব করলো, উষ্ণ ছোট্ট একটা জিভ চেটে দিচ্ছে তার গাল। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেলো তার। জিভ লম্বা করে চেটে দিলো সে বাচ্চাটার মুখ।

হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই। হতভম্ব হয়ে গেলো হোয়াইট ফ্যাং। বিস্মিত চোখে ঈশ্বরদের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করলো, এতো আনন্দের কারণটা কী। হঠাৎ সারা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো ওর। বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লো সে, শুয়েশুয়েই তাকিয়ে রইলো বাচ্চাটার দিকে। আর কলির মহাবিরক্তির কারণ ঘটিয়ে টলমল করতে করতে এগিয়ে এলো অন্য বাচ্চাগুলো। অতি কষ্টে উঠলো তার গায়ের ওপর, ডিগবাজি খেয়ে নেমে এলো মাটিতে, উঠে পড়লো আবার। জীবনে এই প্রথম এ-ধরনের অত্যাচার মুখ বুজে সয়ে গেলো

সে। তাছাড়া, সত্যি বলতে কি, বাচ্চাগুলোর লাফালাফিতে বিরক্তি লাগছে না মোটেই। বরং বেশ একটা আরাম বোধ হচ্ছে। এই আরাম আর মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো হোয়াইট ফ্যাং।